
নিছক প্রেমের গল্প
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

নিছক প্রেমের গল্প

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

Nichhak Premer Golpo
(A collection of short stories)
Code : 55 N 26

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
www.devsahityakutir.com
E. Mail : dev_sahitya@rediffmail.com
Tel : 2350-4294/4295/7887

ISBN. 978-93-5060-126-6

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৮, মাঘ ১৪২৪

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর
লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক
বি. পি এম'স প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর,
দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪ পরগনা
থেকে মুদ্রিত। টাইপ সেটিং
সহদেব চন্দ্র মণ্ডল
কামরাবাদ রবীন্দ্র সরণী,
কলকাতা—১৫০

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল ঘোষ

উৎসর্গ

প্রিয়বন্ধুবর—
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
ও
সৈকত মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

সাময়িক পত্রপত্রিকায় অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর গল্প চোখে পড়লেই পড়ে ফেলি। কেন পড়ি তার কারণও আছে। দু'চার কথায় তা বলা যাক।

কোনও কোনও লেখক মনে করেন গল্প লিখব কিন্তু তাতে গল্প থাকবে না। প্যাঁচালো, জটিল গদ্যে বিবরণ জাতীয় কিছু লিখে তার গায়ে গল্পের তকমা সেঁটে তাঁরা চালিয়ে দেন। অর্থাৎ 'জলে নামব, বেণী ভিজাব না'—অনেকটা সেইরকম।

অভিজ্ঞান কিন্তু গল্প লিখতে বসে গল্পই লেখেন। সহজ, স্বচ্ছ ভাষায় গল্পের কাঠামোটি এমন ভাবে নির্মাণ করেন যা পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে ছাড়ে। তিনি জানেন কারও গল্প দু'এক পাতা পড়ার পর যদি 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা হয় সেই লেখক সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ থাকে না।

অভিজ্ঞানের কোনও গল্পের শেষে থাকে চমক, কোনও গল্পের রেশ বেশ কিছুক্ষণ পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে, আবার কোনও হালকা চালের গল্প মন ভালো করে দেয়।

তাঁর নতুন গল্পের সংকলন 'নিছক প্রেমের গল্প' প্রকাশিত হল। গল্পগুলিতে নিছক নারী—পুরুষের প্রেমই নেই, মিলেমিশে রয়েছে আনন্দ, বিষাদ এবং কঠোর বাস্তবের সঙ্গে রহস্য—রোমাঞ্চ, অলৌকিক, ভৌতিক এমন নানা উপাদান। আধুনিক প্রযুক্তিও বাদ যায়নি। সব কিছুর মিশ্রণে প্রাপ্তি অনেক।

আশা করি 'নিছক প্রেমের গল্প' পাঠকের সমাদর পাবে।

প্রফুল্ল রায়

কলকাতা বইমেলা, ২০১৮

লেখক—পরিচিতি : জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত ও সেই সূত্রে ইংল্যান্ডে প্রবাসী। কর্মসূত্রে বিশ্বের নানান দেশে দীর্ঘদিন থেকেছেন। লেখালেখির শুরু ১৯৯৪—এ কিশোর ভারতী ও আনন্দমেলার পাতায়। লেখার বিষয় প্রধানত কল্পবিজ্ঞান, রহস্য ও ভৌতিক হলেও সাহিত্যের সব ধারাতেই সমান স্বচ্ছন্দ ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ—ক রহস্য, মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন, সঙ্কেত রহস্য, রহস্য যখন ডারউইন, গ্লোবাল ওয়ারমিং, এই পৃথিবী একশো বছর পরে ও আরো অনেক। গল্প সংকলন—ভয়নিচের অজানা ভাষা ও আরো বারো, সব লজিকের বাইরে, ভৌতিক অলৌকিক, নিয়ম যখন ভাঙে, রাতের ট্রেনের সঙ্গী। ওনার একাধিক গল্পের নাট্যরূপ জনপ্রিয় এফ এম চ্যানেলে পরিবেশিত হয়েছে।

লেখালেখি, বিজ্ঞানচর্চা ছাড়াও অভিজ্ঞানের এক নেশা— ব্যাডমিন্টন খেলা।

সূচীপত্র

অপেক্ষা

দাদা, এখানে একটা পোড়ো বাড়ি ছিল না? একতলা বাংলো টাইপের বাড়ি। সাদা। না, সাদা না, বোধহয়, হালকা হলুদ রঙের হবে। সামনে ছোট দালান। কিছু দূরে একটা পুকুর। অবশ্য বছর পনেরো আগের কথা। তখনই কেউ থাকত না। এতদিনে হয়তো ভেঙে নতুন বাড়ি হয়ে গেছে।

বুঝেছি। পোড়ো বাড়ি তো। আপনি ফেলে এসেছেন। ওরে বাবা। ও জায়গায় আবার কে বাড়ি করবে? সে বাড়ি সেরকমই আছে। বহাল তবিয়তে। খানিক আগে ডান দিকে একটা সরু পথ চলে গেছে। সেটা দিয়ে মিনিট খানেকের পথ। অনেকটা জায়গা জুড়ে, খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।—লোকটা আর কথা বাড়াল না। কি সব বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে গেল।

লোকটার কথামতো পা বাড়ালাম।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না। সেই একই রকম আছে। শুধু বাড়ির সামনের জঙ্গলটা আরও বেড়েছে। তবু আগাছা সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে গেলাম। আগে পায়ে চলার যে পথ ছিল, সেটাও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। কিন্তু গাছগুলো একই রকম আছে। সেই ঝাঁকড়া হিমসাগর আমগাছটা, নিমগাছটা আর বিদেশ থেকে এনে লাগানো উইলো গাছটা—কারুরই বয়েস যেন বাড়েনি। একই রকম। শুধু উপেক্ষার—অবহেলার ছাপ চারদিকে। এখন শীতের বিকেল। পাঁচটায় অন্ধকার। আশেপাশে ঘরফেরা পাখিদের ডানা ঝাপটানো আর মাঝে—মধ্যে দূর থেকে বেজে ওঠা শঙ্খধ্বনি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

কিন্তু সে কি এখনও এখানেই থাকে? এতো বছর বাদে চিনতে পারবে তো? দিনের আলোয় তো তাকে কখনো দেখিনি। সে কি আসবে? অন্যবারের মতো।

একটা অদ্ভুত অস্থিরতা অনুভব করলাম। অনুভব করলাম আবেগের কাছে মস্তিষ্ক হার মানছে।

আরেকটু এগোতেই বাড়িটা ডান দিকে পড়ল। কেউ এখন থাকে বলে তো মনে হয় না। কোনো আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে মুখ ঢেকে বাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। খড়খড়ির জানলাগুলোর ভাঙা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে কে যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। বাইরের বারান্দায় কয়েকটা ভাঙা চেয়ার পড়ে আছে। লাল টালির মেঝে বেশ কিছু জায়গায় ভেঙে গেছে। আর নানান ছোট ছোট গাছের চারা সেসব জায়গা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে। বাড়িটা পিছনে ফেলে আরেকটু এগিয়ে পুকুরঘাটের ভাঙা সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসলাম। এটাই আমার পরিচিত জায়গা। বাড়ির কাছেই। কিন্তু বাড়ি থেকে সরাসরি দেখা যায় না। রাত বাড়ছে। একফালি চাঁদ পুকুরের জলে নেমেছে। একটা শির—শিরানি দেওয়া হাওয়া গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চারদিক দিয়ে গাছের ডালগুলো শীতের রিক্ত হাত বাড়িয়ে জল ছুঁতে চাইছে। বারবার হাওয়ায় দুলে দুলে সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে—মধ্যে খসখস শব্দে চারদিকের এই উদাসীন নীরবতার প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

পনেরো বছর আগের কথা। তখন এখানে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মাসির বাড়ি। আর ছুটি মানেই মাসির বাড়ি।

আমি তখন সবে মাধ্যমিক দিয়েছি। সময় অফুরন্ত। শাসন কম। সময়ের হিসেবগুলো হঠাৎ করে উধাও। আমাদের সমবয়সিদের একটা গ্রুপ ছিল। প্রায় সারাদিন আমরা ক্রিকেট খেলে—আড্ডা মেরে বেড়াতাম। তা সেদিনও সারাদিন খেলেছি। আমার যদিও মন সেদিন বেশ খারাপ। শূন্য রানে আউট।

খেলার শেষে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে চলে এসেছিলাম। চোখ পড়ল বাড়িটার লাগোয়া বাগানটার দিকে। গাছে পেয়ারা ঠাসা। কয়েকটা পেয়ারা নিয়ে ফিরে আসব, দূরে পুকুরটার দিকে চোখ পড়ল। পাশের বাড়িতে

কেউ থাকে বলে মনে হল না। ভাবলাম একবার পুকুরটা দেখে আসি। পায়ে পায়ে পুকুরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, কে যেন পাশ থেকে হঠাৎ বলে উঠল—সাবধান! সাপ!

খেয়াল করে দেখি ঠিক দু'ফুট দূরে একটা কালো বেশ বড় সাইজের সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আমারই বয়সি একটা মেয়ে। কেন জানি না মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। পাহাড়ি জায়গায় যেমন মেঘে ঘিরে ধরে, ওকে ঘিরে তেমনই যেন এক ফালি মেঘ। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে ফিরে যাচ্ছি, মেয়েটা ফের বলে উঠল—বাহ, আমাদের বাগানের পেয়ারা নিয়ে যাচ্ছ, আর আমাকে দেবে না! দাও।—বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

আমি ধরা পড়ার লজ্জায় সবকটাই দিচ্ছিলাম। তা মেয়েটা একটা নিল।

আর দাঁড়াইনি।

তা সেটাই প্রথম আলাপ।

তার পরে অনেক দিন দেখা হয়েছে। সন্ধে হলেই ওই পুকুর—ধারে চলে যেতাম। ও পুকুরধারে চুপ করে বসে থাকত। নাম ছিল অহনা।

কথা কমই বলত। শুধু হাসত। আর মাঝে—মধ্যে যেন অন্য কোনো জগতে হারিয়ে যেত। আর তখন মনে হতো আমার চেনা—জানা সবার থেকে ও যেন কোথায় অন্যরকম।

একদিন জিগ্যেস করলাম—আচ্ছা, তুমি কি এখানে থাকো? তোমাকে ছাড়া তো কাউকে এখানে দেখি না! বাড়িটাও সব সময় বন্ধ থাকে।

ও শুধু মুখ তুলে বলেছিল—সবাই চলে গেছে। আমি এখন এখানে একাই থাকি।

তারপরে একটু থেমে বলেছিল—কেন তুমি তো আছ। আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো আবার!

কি যেন বিষণ্ণতা ছিল সে কথায়। কথা দিয়েছিলাম ছেড়ে যাবো না।

আর তাই ছুটি পেলেই হাজির হতাম গিয়ে মাসির বাড়ি। আর দিনের আলো হারিয়ে গেলেই ওই পুকুরপাড়।

কিন্তু কয়েক বছর বাদে ওকে ছেড়ে যেতেই হল। বাবার বদলির চাকরি। সেই সূত্রে আমেরিকায়। আমিও ভালো একটা ইউনিভারসিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। উপায় ছিল না দেশে থাকার।

সেদিনটার কথা আমার মনে আছে। যাওয়ার কয়েকদিন আগের কথা। মাসির বাড়িতে আসাটা উপলক্ষ মাত্র। এসেছিলাম ওর সঙ্গে শেষ দেখা করতে।

পুকুরধারে বসে আছি। রাত বাড়ছে। একটা ঘন কালো মেঘ মাথার উপর থেকে শেষ আলোটুকু চুরি করতে হাজির হয়েছে। হঠাৎ ওর উপস্থিতি টের পেলাম। ও আমার পাশে এসে বসল। কিছুক্ষণের নীরবতার পরে আমার হাতের উপরে হাত রাখল। খানিক বাদে হঠাৎ বলে উঠল—জানি, তুমি আর আসবে না।

অবাক হয়ে বলে উঠলাম—কি করে জানলে?

আমি সব জানি।—তারপর চুপ করে গেল। আমি তবু শুনতে পাচ্ছিলাম। ওর চোখ দুটো যেন বলে উঠল—আমাকে ভুলো না। আমি অপেক্ষায় থাকব।

আমি চোখ সরিয়ে চুপ করে মাথা নিচু করে বসেছিলাম। কথা আসছিল না।

ও বলে উঠল—তুমি একটা ভোম্বল। আমার জন্য কেউ কষ্ট পায়? তুমি জানো আমি কে?

কথা বাড়ালাম না। শুধু ওর ঠান্ডা হাতটাকে আরও কাছে টেনে নিলাম। একটা মেঘের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে গেলাম কিছুক্ষণ।

সেদিন আর বিশেষ কথা হয়নি। আমরা শুধু বসেছিলাম, আর গাছের পাতার ফিসফিসানি শুনেছিলাম। সঙ্গে রয়ে গেল কিছু মুহূর্ত, যা সময়ের হিসেবের বাইরে।

তারপরে পনেরো বছর কেটে গেছে। আমি এসেছি। জানি আজও সে আসবে। আজও সে অপেক্ষা করে থাকবে।

ঠিক তাই। হঠাৎ টের পেলাম ও এসেছে। আমার পাশে এসে বসেছে। মাথার ওপরে কালো মেঘ আর ঝুপ করে নেমে আসা অন্ধকারকে সঙ্গে নিয়ে।

কি খুব সাহসী হয়ে গেছো দেখছি। এতো রাতে। ভয় নেই?

আমি হেসে বলে উঠলাম—না, আর ভয় নেই। তা আমাকে ভোলোনি তো?

কি করে ভুলব বল তো? তোমার তো অনেক কিছু আছে। আর আমার সঙ্গে আছে শুধু থেমে থাকা সময় আর তুমি। এত সহজে ভুলতে পারি!

বলে একটু থেমে খিলখিল করে হেসে বলে উঠল—ভোম্বল। কিছুই বোঝে না! যাকে দেখা যায় না, তাকেই শুধু দেখতে চায়। যাকে ধরা—ছোঁয়া যায় না, তাকেই ছুঁতে চায়। সাধে বলি ভোম্বল!— বলে আমার আরও কাছে এসে বসল।

আমি হেসে বলে উঠলাম—জানব না কেন! সব জানি। এ বাড়িতে ডাকাতির কথা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি। সবাই নাকি খুন হয়েছিল। তোমার বাড়ির লোকেদের সবার ডেডবডি পরে পাওয়া গেলেও, তোমায় তো খুঁজে পাওয়া যায়নি! কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

ও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে আনমনে বলে উঠল— আমাকে ওরা মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। মজা দেখো। আমি জলে ভয় পেতাম। আর সেই আমারই থাকার জায়গা হল জলে। হঠাৎ করে অঙ্ক, ভূগোল, বাংলার খাতা ফেলে, মা—বাবাকে ছেড়ে এখানে। কয়েকটা মুহূর্ত সব কিছু বদলে দিয়ে চলে গেল। আর আমি একা হয়ে গেলাম।

একটু থেমে ফের বলে উঠল—তা আমার কথা তো অনেক পুরোনো কথা। তোমার কথা বল।

আমি মুচকি হাসলাম—কেন তুমি তো সবই জানো! জানো না!

ও হেসে উঠল। আমার হাতটা কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠল—যাক বাবা, আর তো তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে না। ভালোই হয়েছে। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে ভালো হয়েছে। নির্ঘাত গাড়ি চালানোর সময় আমার কথাই ভাবছিলে তখন। তাই না!

একটা ঠান্ডা বাতাস আমার ঠোঁটে এসে লাগল। দমকা হাওয়ায় কিছু পাতা এসে পড়ল পুকুরের জলে। একটা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল সামনের জলে। অনেক দিন বাদে নতুন কোনো অতিথি এসেছে এখানে।

—

ক্যামেরার বাইরে

এক

হাতঘড়িটা দু'বার কেঁপে উঠল। আর তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল রঞ্জন। মেসেজ এসেছে। একটা ছবি। গাড়ির একটা সিটবেল্টের ছবি। হঠাৎ করে হৃৎস্পন্দন থেমে গেল রঞ্জনের। এ ক'দিন যা ভাবছিল সেটাই কি ঠিক? কেউ কি ওর অতীত জেনে গেছে? জেনে গেছে সেই ঘটনার কথা?

গত কয়েকদিন ধরেই ওর এটা মনে হচ্ছিল যে কেউ যেন ওর অতীতের সব কিছু জেনে গেছে। কি করে জানল সেটাই প্রশ্ন। কাঁপা হাতে ঘড়িটা মুখের কাছে এনে যার কাছ থেকে মেসেজটা এসেছে তাকে ফোন করল রঞ্জন। উলটো দিকে সাড়া পেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল—কে আপনি?

উলটো দিক থেকে শুধু হাসির আওয়াজ এল। তারপরে সেই অচেনা কণ্ঠস্বর ফের বলে উঠল—পারফেক্ট মার্ডার। কি ঠিক বলছি তো? কেউ—কেউ বুঝতে পারেনি, কিন্তু তবু দাগ রয়ে গেছে। তা এখন একটু কথা বলা যাবে কি?

দুই

কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। রঞ্জনের গাড়ি মোটরওয়ের ফাস্ট লেন দিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফাস্ট লেন তাদেরই জন্য যারা সমাজের চোখে সম্মানিত। এটা সবার ভাগ্যে জোটে না। প্রত্যেকের স্বভাব, ব্যবহার, সামাজিক অবস্থান, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এসব নানান প্যারামিটারের জটিল সমীকরণের উপর নির্ভর করেই একজন আস্তে আস্তে এই ফাস্ট লেন ব্যবহার করার অধিকার পায়। এ অধিকার অর্জন করতে হয়। আর রঞ্জন সে অধিকার অর্জন করেছে বহু বছরের সাধনায়।

এই বাড়তি অধিকারটা শুধু যে রাস্তায় ফাস্ট লেনে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, তাই নয়। সব ক্ষেত্রেই এর জন্য বাড়তি সুযোগ মেলে। দোকানে এর জন্য বিশেষ লাইন, অনলাইনে কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট, সরকারি বিশেষ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ, সব থেকে ভালো ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসার সুযোগ,কম ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম। এরকম আরও নানান সুযোগ—সুবিধে। অসুবিধে একটাই। এটা কিন্তু কোনো চিরকালীন ব্যবস্থা নয়। দু—একটা নিয়ম ভাঙো, দু—একজনের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করো, কোনো একটা খারাপ কাজ করে ধরা পড়ো, ব্যস, পয়েন্ট হুস করে নোজ ডাইভ দেবে। সঙ্গে সঙ্গে এ সমাজ তোমাকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে দেবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও রঞ্জন খুশি নয়। গত কয়েকমাস রীতিমতো মানসিক অবসাদে ভুগছে ও। এটাই কি জীবন! রোজ কি এভাবেই কাটবে? হাতঘড়িতে এখন ঠিক ছ'টা দশ। ওর গাড়ি এখন দমদম এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে রোজ ও ঠিক এখান দিয়েই যায়। কৃষ্ণনগরে ওর বাড়ি পৌঁছবে ঠিক ছটা কুড়িতে। লিফটে ওঠার মুখে রোজকার মতো শমিতবাবুর সঙ্গে দেখা হবে। শমিত ঠিক ওই সময়ে ওর কুকুরটাকে নিয়ে পনেরো মিনিটের জন্য রাস্তায় হাঁটতে বেরোয়। রোজকার মতো ওর দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করবে—'ভালো আছেন তো?' তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে যাবে বাইরের গেটের দিকে।

আচ্ছা, একটা দিন কি একটু অন্যরকম হতে পারত না? একটু ট্রাফিক জ্যাম, একটু নিয়ম ভাঙা, একটু দু—একটা গাড়িতে ধাক্কা, লোকেদের মধ্যে সামান্য ঝগড়া—মারপিট, এরকম অপ্রত্যাশিত কিছু। নাহ।

আজকের যুগে এটা সত্যিই আশা করা যায় না। পয়েন্ট কমে যাবে। সেরকম পয়েন্ট কমে গেলে তারপরে হাসপাতালেও ভর্তি হওয়া যায় না। স্টেডিয়ামেও খেলা দেখতে যাওয়া যায় না। এখনকার দিনে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে দু—একজন আছে তারাও সবাই এড়িয়ে চলবে। তাই সবাই ভালোমানুষ থাকতে বাধ্য হয়। অন্তত সেরকম মুখোশ পরে থাকে। ফাঁকা রাস্তাতেও সরকার— বিরোধী গালাগালি দিলে বা নিয়ম ভাঙলে লুকোনো ন্যানো ক্যামেরা সব রেকর্ড করে নেবে।

আজ হঠাৎ কি মনে হতে বড় রাস্তা ছেড়ে রঞ্জন অন্য পথ ধরল। নাহ, আজ ও বাড়ি যাবে না। অন্য জায়গায় যাবে। কি যেন জায়গার নামটা? নিজস্ব জগৎ। সেখানেই যাবে।

কয়েক দিন আগে একটা শপিংমলের খাবারের দোকান থেকে একরাশ বিরক্তি নিয়ে ও বেরোচ্ছিল। বিরক্তির কারণও ছিল। কিনে বেরোনোর সময় ওকে দেখে কাউন্টারের রোবট মহিলা মিষ্টি হেসে বলে উঠেছিল—আপনার ছেলেকে জানাই আমাদের তরফ থেকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

কথাটা অন্য সময় হয়তো খারাপ লাগত না। কিন্তু এক্ষেত্রে লাগল। সকাল থেকে তিনবার ফোন করেও দীপুকে পায়নি রঞ্জন। দীপু পড়াশোনা করে ফ্রান্সে। একবার তো অন্তত ফোন করতে পারত। গত ছ'মাসে একবার মাত্র যোগাযোগ করেছে। অথচ চারদিকে ফোন, হাতের তালুতে ইন্টারনেট। হাত বাড়ালেই এখন ইচ্ছে থাকলে যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু প্রযুক্তি যত ভৌগোলিক দূরত্ব কমিয়েছে, ততই সম্পর্কের দূরত্ব বাড়িয়েছে।

তাও ঠিক ছিল। দীপুর ব্যাপারটাতে না হয় রাগ হওয়াটা অমূলক, মেয়েটার এত কিছু জানার কথা নয়। কিন্তু পরের কথাটাতে আরেকটু হলেই মাথা গরম করে পয়েন্ট হারাতে বসেছিল রঞ্জন।

ট্রলি থেকে সন্দেশের বাক্সটা বার করে রেখে ওই রোবট মহিলা ফের বলে উঠেছিল—এটা তো আপনাকে দিতে পারছি না। বারণ আছে। আর আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধগুলো নিলেন না? ওটা কি অন্য জায়গা থেকে নিয়েছেন? আপনি তো বরাবর এখান থেকেই নেন।

ইচ্ছে করেই একসঙ্গে নেয়নি রঞ্জন। সন্দেশের বাক্স আর ডায়াবেটিসের ওষুধগুলোর মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ সম্পর্কটা যদি কেনার সময় কেউ ধরে ফেলে এই ভয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধরা পড়ে যাওয়ায় আরও বিরক্ত হয়েছিল রঞ্জন।

তবু বিরক্তি প্রকাশ না করে ঘাড় নেড়ে হেসে জানিয়েছিল যে ওষুধ ওর লাগবে না। আগেই নিয়ে নিয়েছে। বলেই মনে হল, কথাটা যে ভুল সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই এরা জেনে যাবে। কারণ সবাই নিয়মমতো ওষুধ খাচ্ছে কিনা সে হিসেব সরকার রাখে। কিছুদিনের মধ্যেই ওর বাড়িতে নোটিশ এসে যাবে। সে যাকগে, খুব বেশি পয়েন্ট মনে হয় না কাটা হবে তার জন্যে।

মুশকিলটা হল ওর জগৎটা এখন আর ওর নিজস্ব জগৎ নেই। চারদিকে ওর সম্বন্ধে এতো তথ্য ছড়িয়ে আছে, যে মাঝে—মধ্যে মনে হয় ও যেন এ সমাজের গিনিপিগ। একটা কাচে ঘেরা ঘরে ওর বাস, যেখানে ওকে সবাই বাইরে থেকে দেখছে। দিনরাত লক্ষ রাখছে। ওর জীবনের প্রত্যেকটা তথ্য সবার জানা। সেটা ওর জন্মদিন হোক, ওর পছন্দের কোনো পোশাকের ব্র্যান্ড হোক বা ওর অসুস্থতা হোক। ও যেন একটা অবজেক্ট। আর চারদিকে লাগিয়ে রাখা সিসিটিভি ক্যামেরা ওকে দেখে যাচ্ছে, আর হিসেব মিলিয়ে যাচ্ছে। হিসেব না মিললেই মুশকিল। প্রশ্ন উঠবে।

তা এসব ভাবতে ভাবতে মলের খাবারের দোকানটা থেকে বেরিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা মিনিস্কার্ট পরা সুন্দরী মহিলা মডেল ওর দিকে এগিয়ে এল। আর তারপরে ওর দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। তাতে শুধু লেখা—'আপনার নিজস্ব জগৎ।' আর তার নীচে ছোট করে লেখা 'সব ক্যামেরার বাইরে।'

কি ব্যাপার—জিগ্যেস করে উত্তর পায়নি। ওই বছর তিরিশেকের মহিলা শুধু মুচকি হেসেছিল।

রঞ্জন ইলেক্ট্রনিক কাগজটা থেকে ওই ঠিকানাটা ফোনে ট্রান্সফার করে নিয়েছিল তখনই। মাঝে কয়েকদিন যাওয়ার ইচ্ছে হলেও পরে ভয় পেয়ে আর যাওয়া হয়নি। কোনো বিপদে পড়বে না তো!

কিন্তু না। আজ আর না। একটা দাগকাটা মাঠে ভেড়ার মতো সারা জীবন কাটানোর কোনো মানে নেই। গাড়ি ঘোরাল রঞ্জন। যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। রাজারহাট পেরিয়ে পূর্ব কলকাতার একেবারে প্রান্তে অফিসপাড়ায় একটা বহুতল বাড়ি। তার তেরো তলায় ওদের অফিস। অফিসের নাম 'ক্যামেরার বাইরে'।

যাক, ভুল ঠিকানায় আসেনি। কাচের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। ঢোকার পরেই বড় হলঘর। দেওয়ালে ওর নাম ফুটে উঠেছে—ওয়েলকাম রঞ্জন রয়।

এটা অবশ্য অবাক হওয়ার মতো কিছু ব্যাপার নয়। প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকে জেনেটিক কোড কার্ড, তার নিজস্ব জেনেটিক সিকোয়েন্সের উপর ভিত্তি করে। এই কার্ডই একজনের পরিচয়। তাই শনাক্তকরণে কোনো ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর তাই দেখে আজকাল অনেক অফিসেই এভাবে অভ্যর্থনা জানায়।

ঘরের মধ্যে বাতাসে ভেসে ওঠা এ অফিসের নিয়মগুলোতে চোখ বুলোল রঞ্জন। লম্বা লিস্ট। সহজ কথায় বলতে গেলে এখানে কারুর নজরদারি নেই। অত্যাধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা মস্তিষ্কের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে জেনে নেবে কার কি পছন্দ। আর ঠিক সেভাবেই তার জন্য তার পছন্দের পরিবেশ তৈরি করা হবে। গড়ে তোলা হবে তার নিজস্ব জগৎ। অর্থাৎ রঞ্জনের যদি পাহাড়ে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার ইচ্ছে হয়, ঠিক সেরকমই পরিবেশ তৈরি করে দেবে এ যন্ত্র। রঞ্জনের বলারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশমতো একটু এগোতেই সার দিয়ে ঘর। বাতাসে ভেসে ওঠা তিরচিহ্ন ওকে একটা ঘরে ঢুকতে বলল। ঘরটা একটু অন্যধরনের। সামনের দিকটা ছোট, কিন্তু চওড়ায় ক্রমশ বেড়েছে। আর তাই ঘরের অন্য প্রান্তটা বেশ বড়। পুরোটা কাচের। একটু এগিয়ে গেলেই ঘরের মধ্যে আরেকটা কাচের ঘর। এতোগুলো কাচের ঘর, ঘরের মধ্যে ঘর যে বেশ একটা ঘোর তৈরি হয় মনের মধ্যে।

তা সে যাই হোক। সেই ঘরের মধ্যে বড় একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র। নির্দেশমতো সেখানে ঢুকে চেয়ারে বসতেই চারদিক দিয়ে নানান যন্ত্র নেমে এল। একটা হাত নেমে এসে ওর মাথার উপরে একটা হেলমেট পরিয়ে দিল। পিঠের পিছনের চেয়ার শরীরের শেপ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যেন আঁকড়ে ধরল রঞ্জনকে।

চোখের সামনের অন্ধকারটা আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করল। একটা বড় বাড়ি। তার ভেতরে বড় উঠোন। আর সেখানেই ও দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক দিয়ে বারান্দা। বড় বড় থাম। মুহূর্তে রঞ্জনের বুঝতে অসুবিধে হল না, ও কোথায় এসে পড়েছে। এটাই ছিল ওর প্রিয় বন্ধু বাসবের বাড়ি। স্কুলে পড়ার সময় একটু সময় পেলেই ও এখানে চলে আসত। ওর বাড়ি ছিল এখান থেকে আধ কিলোমিটার। প্রায় এক পাড়াতেই বলা যায়। কিন্তু বাড়িতে এতটা জায়গা ছিল না বলে এখানেই খেলাধুলার জন্য চলে আসত। কখনও ক্রিকেট, কখনও ফুটবল। কখনও দাবা, বা কখনও নেহাতই আড্ডা। পাড়ার বেশ কয়েকজন ছেলেও আসত খেলতে। একসঙ্গে খেলা হত ওদের বাড়ির তিনতলার ছাদে। এ জায়গার এক আলাদা আকর্ষণ ছিল।

আজকে আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না ও। বারান্দায় উঠে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল রঞ্জন। বেশ চওড়া উঁচু ধাপের সিঁড়ি। সেটা দিয়ে দোতলায় উঠে বাঁদিকের প্রথম ঘরটাতে ঢুকল রঞ্জন। এখানেই ওরা একসঙ্গে বসে আড্ডা মারত, খেলা দেখত টিভিতে। গল্পের বই পড়ত। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রঞ্জন। ফাঁকা ঘর। ঘরের অন্য দিকে বারান্দা। বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল রঞ্জন। পাশেই বড় বাগান। সামনে নিম, বকুল আর একটা রঙচঙে পাতাবাহার গাছ। বাইরে কলকাতার হালকা শীতের রোদ। দূরে অন্য বাড়ির কার্নিশে বসে একটা কাক সমানে ডেকে যাচ্ছে।

রনু, তুই?

হঠাৎ বাসবের ডাকে চমকে উঠল ও। কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ও। ঠিক একই রকম দেখতে আছে। স্বপ্নালু চোখ। ছোট করে কাটা চুল। হালকা গোঁফের রেখা। ছেলে—মানুষি হাসি।

কিরে কখন এলি? কত দিন বাদে। আয়, তোকে একটা জিনিস দেখাই।—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দা দিয়ে বাসব ছুট লাগাল।

বাসবের পিছন পিছন রঞ্জনও ছুট লাগাল। বহুদিন বাদে এরকম ছুটল। দোতলার বারান্দা দিয়ে কোণের একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বাসব। দরজা খুলে ঢুকে মাটির উপরে রাখা ডাঁই বইয়ের স্তূপের মধ্যে থেকে একটা বই বার করে বাসব বলে উঠল—আমার থেকে লুকোনো! দেখ কি পেয়েছি? তোর লেখা গল্প। তুই তো আগে বলিসনি যে তুই এইসব নামকরা পত্রিকায় লিখিস? আরেকটা জিনিস দেখাই। মিকি। ল্যাব্রাডরের বাচ্চা। বাবা কিনে এনেছে। সারাক্ষণ আমার পিছন পিছন ঘোরে।—বলে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অনেকদিনের অনেক কথা জমেছে ওর। পিছন পিছন রঞ্জনও বেরিয়ে এল।

পত্রিকাটা হাতে নিয়ে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, এই সময় হঠাৎ পিয়ালির গলা শুনতে পেল।

আমিও পড়েছি গল্পটা। খুব ভালো লেগেছে। তবে সানুকে না মারলেই পারতে।

এই প্রথম পিয়ালি ওকে উদ্দেশ করে কিছু কথা বলল। এতোটাই অবাক হয়েছিল যে উত্তরের কোনো ভাষা খুঁজে পেল না রঞ্জন। শুধু মুচকি হাসল।

পিয়ালি ওদের থেকে কয়েক মাসের ছোট। এক ক্লাস নীচে পড়ত। স্কুলজীবনে রঞ্জনের প্রথম ভালো লাগা। যদিও মুখে কোনো দিন প্রকাশ করেনি। কোনো দিন কাউকে বুঝতেও দেয়নি। লম্বা রোগা চেহারা পিয়ালির। ফর্সা। কোমর অব্দি চুল। দেখতে খুব সুন্দর না হলেও খুব আকর্ষণীয় ছিল। আর ওকে দেখার আকর্ষণেই বারবার ছুটে যেত বাসবের বাড়িতে। ওকে নিয়েই লিখেছিল রঞ্জন ওর প্রথম কবিতা। পিয়ালি কিন্তু খুব চুপচাপ থাকত। আর ওদের সবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখত। ওই কোণের ঘরের পাশের ঘরটাই ছিল ওর ঘর। বেশির ভাগ সময় বই নিয়েই বসে থাকত। ঘরের বাইরে কখনো দেখা যেত না। পিয়ালি হল বাসবের কাকার মেয়ে। কাকা আর কাকি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছিল ও ছোট থাকতে। মেয়েটাকে দেখলেই তাই খুব কষ্ট হতো রঞ্জনের। চোখের দৃষ্টিতেও তাই কিরকম বিষণ্ণতার ছাপ।

একদিন বাসবকে জিগ্যেস করেছিল—আচ্ছা, তোর বোনটা ওরকম কেন বল তো? কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মেশে না। কিরকম, তাই না?

হ্যাঁ, ও ওরকমই। একা থাকতে ভালোবাসে। আর আমাকে খুব হিংসে করে। আমার মা বলে ওর বাবা—মা না থাকায় ও নাকি ওরকম।

তা বাসব ওর সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন, রঞ্জনের তাতে ভালোলাগা একটুও কমেনি। সুযোগ পেলেই খোলা জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারত রঞ্জন। ঘরের অন্যদিকে একটা টেবিল—চেয়ার পাতা। আর তাতে বসে মেয়েটা কি যেন ভাবত সামনে বই রেখে। অনেক দিন কথা বলার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু সাহস হয়নি।

আজকে ওর দিকে প্রথমবার ভালো করে তাকাল। পিয়ালি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে কি যেন ছিল। লজ্জা, আগ্রহ, ভালো লাগা, নাকি অন্য কিছু?

খেয়াল করল বাসব নেই। বারান্দায় ওদের কাছাকাছি আর কেউ নেই। যেন হঠাৎ করে ওদের দুজনকে কথা বলার জন্য কিছুটা সময় উপহার দিয়ে গেছে সবাই। ও এগিয়ে গেল পিয়ালির দিকে। পিয়ালিও এগিয়ে এল। ঠোঁটে ঠোঁটে স্পর্শ। একটা উত্তেজনা যেন ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে। পিয়ালিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ও। ওর শরীর—ওর হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করতে পারল। বাতাসের উষ্ণতা যেন বেড়ে গেল। সময় সময়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

অনেক দিন কথা বলতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু কথা বলা হয়নি। আজকে শব্দ যেন হারিয়ে গেল। আজকেও কথা বলা হল না।

রঞ্জন বাস্তবে ফিরে এল প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে। যেন একটা স্বপ্ন। কেউ যেন অতীতের ঘটনাগুলো থেকে কুড়িয়ে আনা কিছু অংশ নিয়ে বাকিটা ইচ্ছেমতো জুড়ে গল্প তৈরি করে দিয়েছে ওর জন্য। আর তাই অনেক কিছুই যা ও ভুলেই গিয়েছিল, যেমন ওর প্রথম লেখা গল্প, সেই পছন্দের বইপড়ার কোণের ঘর, বাগান,

বাসব, ওই প্লাস্টার খসা দেওয়াল আর পিয়ালি—সব ফিরে এসেছিল খানিকক্ষণের জন্য। এরকম ভারচুয়াল রিয়ালিটির অনেক শোও আগে দেখেছে। কিন্তু এরকম পারসোনালাইজড অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। কেউ যেন ওর স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া মণিমুক্তোগুলো খুঁজে এনে খানিকক্ষণের জন্য সাজিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন চলে আসার পরে আবার ওখানে মাঝে—মধ্যে যাবে ঠিক করেছিল রঞ্জন। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

সেদিনের কথা যখনই মনে পড়েছে, মনে হয়েছে ও যেন একটা অজানা রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে। তার ধার দিয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টের আলো পেরিয়ে যাওয়ার সময় ওর ছায়া আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়েছে, ওর আগে এগিয়ে গেছে। ওর মনে হয়েছে ওই ছায়াই যেন ওর পরিচয়। কিন্তু পরের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় সে ছায়া আবার হারিয়ে গেছে। এ যেন সেরকমই নিজেকে খুঁজে পাওয়া, জীবনের এক অন্য মাইলফলকে। তারপরে আবার হারিয়ে যাওয়া।

তিন

পার্কে বসেছিল রঞ্জন। আচ্ছা, জীবনটা কি একটু অন্যরকম হতে পারত না? যদি ওই ভারচুয়াল রিয়ালিটির জগৎটাই সত্যি হত। সত্যি করে যদি পিয়ালিকে কোনোদিন ওর মনের কথা খুলে বলতে পারত। কত ছোট একটা ঘটনা থেকে সব কিছু পালটে যেতে পারত।

নীল আকাশ। কিছু সাদা—কালো মেঘ নিজেদের মধ্যে জিগস পাজলের মতো ভাঙছে, জুড়ছে। সামনের ঝিল থেকে উঠে আসা কয়েকটা রাজহাঁস সামনে ঘোরাঘুরি করছে। এর মধ্যে একটা লোক এসে পাশের বেঞ্চিতে বসল।

রোগা চেহারা। ফর্সা রঙ। চোখে রিমলেস চশমা। চশমার আড়ালে একটু ক্লান্ত চোখ। চাপদাড়ি। সাদার উপরে লাল ডোরাকাটা শার্ট। হঠাৎ রঞ্জনকে উদ্দেশ করে বলে উঠল—এ জায়গাটা আগের মতোই আছে। তাই না?

আগের মতো মানে?

না মানে, আজকাল তো সবই পালটে গেছে। তার মধ্যে এটা এখনও পালটায়নি। পঞ্চাশ বছর আগেও ঝিল ছিল। এখনও আছে। রাজহাঁসগুলোকে দেখুন। ওরা এখনও লাইন করে কিরকম যায়। তাই না? আমাদের মতো জোর করে নিয়ম মানতে বাধ্য করা হয় না। নিয়মের ভয়ে সবসময় মুখোশ পরেও থাকতে হয় না ওদের।

একটু থেমে ফের বলে উঠল—'The Unknown boy' পড়েছেন?

না, কেন?

খুব ভালো লেখা। পাঁচ বছর আগে ইংল্যান্ডে বইটা প্রকাশিত হয়েছিল। এখনও বেশ জনপ্রিয়। লেখিকা লিখেছেন একটা ছেলের কথা যে একটা মেয়ের পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারত। উঁকি মারত তার অন্ধকারে ঢাকা একঘেয়ে জীবনে। আর বুঝতে পারত না যে মেয়েটাও তাকেই চায়। সেও ওই পর্দা সরানোর অপেক্ষায় থাকে। জানলার পর্দা সরালে আলো আসে। আর সে আলো এসে পড়ে ওর বইয়ের উপরে। মেয়েটা সে আলোটাকেই দেখে আর ছেলেটার সম্বন্ধে কল্পনা করে, তাকে না দেখেই। ভাবে মাথা ঘোরালেই বুঝি সে তাকে দেখে ফেলবে, আর তখন ওকে ভালো দেখতে না হওয়ায় আর হয়তো আসবে না। বেশ রোমান্টিক লেখা বুঝলেন। লেখিকার নাম পিয়া সান্যাল। আমার তো আবার লেখাটা পড়ে আপনার কথাই মনে হচ্ছিল। এতো কিছু তো আর আগে জানা ছিল না।

এবার চমকে ওঠার পালা রঞ্জনের।

কি বললেন পিয়া সান্যাল?

হ্যাঁ, ওই পিয়ালি সান্যাল আর কি! নামটা একটু ছোট করে রেখেছে।

তা আপনি আমার কথা জানলেন কি করে?

খেয়াল করুন। ঠিক মনে পড়ে যাবে।—বলে লোকটা মুচকি হেসে বলে উঠল—ঠিক যেমন মনে পড়ে যাবে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টের কথা।

রঞ্জন চমকে উঠল। গম্ভীর হয়ে বলে উঠল—কে আপনি?

আমি কে না জানলেও হবে। শুধু এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে আপনার বয়েস আর এই সালটাকে গুণ করলে যে অঙ্কের টাকা হয়, সেই টাকাটা ডলারে পাঠিয়ে দিলেই হবে। তা না হলে,—একটু থেমে লোকটা ফের বলে উঠল—সরকার তো আবার মৃত্যুদণ্ড চালু করার কথা ভাবছে। সে খবরটা রাখেন নিশ্চয়ই। অপরাধ ধরা পড়লে কি যে হবে বলা মশুকিল!

বলে লোকটা মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল। তারপরে শিস দিতে দিতে ধীরেসুস্থে হাঁটা শুরু করল পার্কের গেটের দিকে।

রঞ্জন কাঁপা হাতে লোকটার রেখে যাওয়া কাগজটা তুলে নিল। বুঝল ফাঁদে পড়ে গেছে। জোরে চেঁচিয়ে বলে উঠল—আপনি ঠিক কি কি জানেন?

লোকটা ঘাড় না ঘুরিয়েই বলে উঠল—

সব কিছু, আপনি যা জানেন। আপনার মেমারির পুরো ডাউনলোড আমার কাছে আছে। ৩১২ পেটাবাইট। ওটা আপাতত শুধু আমার কাছেই। কিন্তু না পেলে, আরও অনেকে জানতে পেরে যাবে। আর শুধু তো এই সব ঘটনা নয়, আরও অনেক কিছু আছে ওর মধ্যে। বেশ ইন্টারেস্টিং। এই যেমন আপনার যার যার উপরে রোজ রাগ হয়, তাদের ছবি নিয়ে রাতে মনের সুখে বন্ধ ঘরে গালাগালি দেন। তাই না? তবে আমরা চাই না 'আপনার নিজস্ব জগৎ' ভেঙে যাক আর সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে আপনি 'ক্যামেরার বাইরে'ই থাকুন। নিশ্চিন্তে।

এবার ব্যাপারটা বোধগম্য হল রঞ্জনের। লোকটা না দাঁড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল গেটের দিকে। তার মানে ওই 'ক্যামেরার বাইরে'—তে যাওয়াই কাল হয়েছে। ওখানেই ওর সব অতীতের ঘটনার স্মৃতি মস্তিষ্ক থেকে চুরি করে নেওয়া হয়েছে।

দীপাকে বিয়ে করাটা যে ঠিক হয়নি, সেটা বিয়ের এক মাস পর থেকেই বুঝেছিল রঞ্জন। ওর সঙ্গে রঞ্জনের কোনোদিনই মনের মিল হয়নি। কিন্তু বিয়ে করাটা যত সহজ, বিয়ের থেকে বেরোনোটা আরও শক্ত। বিশেষ করে বিয়ে ভাঙার জন্য অনেক পয়েন্ট কাটা হয়।

সেদিন সকাল থেকে জোর বৃষ্টি। গাড়ি জোরে চালাতে গিয়ে দেখতে না পেয়ে বাঁকের মুখের একটা গাছে রঞ্জন ধাক্কা মেরেছিল। রঞ্জনের সঙ্গে ছিল দীপা। স্পট ডেড। রঞ্জনও আঘাত পায়। কিন্তু সিটবেল্ট থাকার জন্য বেঁচে যায়। কিন্তু দীপা সিটবেল্ট না পরে থাকার জন্যে মারা যায়। ওর মাথাটা সামনের কাচে এসে লেগেছিল। তারপরে আর জ্ঞান ফেরেনি।

দীপা যে এমনিতেই সিটবেল্ট পরত না তা পুলিশ পুরোনো ছবি থেকে দেখেছিল। তাই ওই দিন না পরার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। সেদিন বিশেষ কিছু অতিথির বাড়িতে আসার কথা ছিল। আর তাই জোরে চালাতে বাধ্য হয়েছিল রঞ্জন। রঞ্জনের নাইট ড্রাইভিং—এর যে কিছু সমস্যা ছিল সেটা এ ঘটনার কিছুদিন আগে একটা মাইনর অ্যাক্সিডেন্টেও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। তাই—রঞ্জনের উপর কারো কোনো সন্দেহ হয়নি। বিশেষ করে যার পয়েন্ট অতো বেশি, তাকে এতো সহজে সন্দেহ করা যায় না।

পারফেক্ট মার্ডার। রঞ্জন জানত ওর আসল উদ্দেশ্যটা কেউ কোনোদিন বুঝতে পারবে না। ভাববে এটা অনিচ্ছাকৃত একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

কিন্তু সব কিছুরই তো দাগ থেকে যায়। এখানেও তাই রয়ে গিয়েছিল। নিজের কাছেই। নিজের স্মৃতিতে।

রঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। ঝিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। একটু হেঁটেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর নিজের ছায়াটাকে লক্ষ করে। সেটা আবার ওর আগে এগিয়ে গেছে। আর ও যেন তাতে ঢাকা পড়ে গেছে।

—

ফিরে পাওয়া

দীপু না?

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। সৌম্য, আমার স্কুলের বন্ধু। বারো বছর একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি। তিরিশ বছর বাদে দেখা। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে ওর? গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হাড় জিরজিরে চেহারা। চোখের তলা বসা। মাথা জোড়া টাক। বয়স যেন সময়ের অনেক আগেই চোখে—মুখে থাবা বসিয়েছে। একটা রংচটা সবুজ শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে অজানা বিষণ্ণতা।

জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম,—কী খবর? এরকম চেহারা হয়েছে কেন? কী করিস এখন?

বলছি, একটু ফাঁকায় চল, এখানে কথা বলতে অসুবিধা হবে।

ঠিকই, এই ভিড়ের মধ্যে কথা বলা অসম্ভব। ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। এ ওর গায়ের ওপর এসে পড়ছে। যতদূর দেখা যায় শুধুই লোকের মাথা। নানান বয়সের মহিলা পুরুষ বাচ্চা—সবাই উৎসবে মেতেছে। খানিক দূরে দূরে স্টল। তাতে নানান ধরনের পানীয় রাখা। অনেক রকম ফাস্টফুডের স্টল।

প্রায় এক মাইল দূরে স্টেজ। খালি চোখে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। তবে জায়গায় জায়গায় বড় বড় ইলেকট্রনিক স্ক্রিন রাখা, তাতে স্টেজের ছবি দেখানো হচ্ছে। বেশ কয়েকজন কলাকুশলী একটা মাতাল করা গানের তালে তালে স্টেজের ওপর নাচছে। সেই একই ছন্দে নেচে চলেছে এই মাইল খানেক এলাকায় ছড়িয়ে থাকা দর্শকরা।

কারো যেন কোনো পরিচয় নেই, লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই। বাঁধন ছেঁড়া আনন্দে পরিচিত—অপরিচিতের দাগ মুছে গেছে। আমি নিজেও খানিক আগে নাচছিলাম। অবশ্য এখনকার দিনে এমনিতেও চেনা—অচেনা কথাটার তাৎপর্য হারিয়ে গেছে। চেনা মুখ খুব দ্রুত অচেনা হয়ে যায়—অচেনারা চেনার জায়গা নেয়।

সে যাক গে, পরিবর্তন তো আসবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। ভিড় এড়িয়ে ফাঁকা জায়গার খোঁজে সৌম্যর পিছু নিই। খানিক বাদে একটা ক্যাফের দিকে নির্দেশ করে সৌম্য। বলে ওঠে—চল, ওখানেই বসা যাক। দুটো কফির অর্ডার দে। আমার পকেট ফাঁকা।

ওর চেহারা দেখে আগেই বুঝেছিলাম, কথাতেও বুঝলাম—ওর অবস্থা খুবই খারাপ।

দু' কাপ এক্সপ্রেসো নিয়ে মুখোমুখি বসলাম। বাইরের উন্মাদনা, চিৎকার, শরতে নীল আকাশ—হালকা সাদা নানান নকশার মেঘের জিগস পাজল ভাঙা—গড়া দেখার মধ্যে যে আনন্দ ছিল—সবটুকু হারিয়ে গেল সৌমার মুখের দিকে একঝলক তাকাতেই। দুঃখ—বিষণ্ণতা যে মুখে এত গভীর দাগ কাটতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

কপালে দুই ভুরুর মধ্যে গভীর খাঁজ। আমার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে উঠল—কেমন আছিস?

ভালো, একরকম চলে যাচ্ছে।

কী করছিস?

আই রোবটসের নাম শুনেছিস? আড্ডা মারার রোবট তৈরি করে। ওরই মার্কেটিং—এ আছি। 'দুঃখের সময়—সুখের সময়— সবসময়—আপনার সঙ্গী—আই রোবট'—অ্যাডটা দেখেছিস? আমার তৈরি। বেশ একটা নাটকীয় কায়দায় বলে উঠলাম।

কিন্তু উৎসাহটা নিভিয়ে দিয়ে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললে সৌম্য। কফির কাপটা মুখের কাছে এনে আওয়াজ করে একটা চুমুক দিয়ে ফের বলে উঠল—

বাড়ি থেকে বেরোস না একদম, তাই না?

না, তেমন দরকারই হয় না। বাড়িতে থেকেই কাজ করি। ওই, মাঝে—মধ্যে রেয়ারলি বেরোই।

তার মানে খোঁজখবর কিছুই রাখিস না, তাই তো?

তা কেন রাখব না? ইন্টারনেট আছে, খবরের কাগজ আছে, টিভি আছে, ফোন আছে, ভার্চুয়াল নলেজ সেন্টার আছে, নিউজ ফিড আছে—চাইলেই ঘরে বসে সারা বিশ্ব। সব খবর রাখি। তা হঠাৎ করে এমন প্রশ্ন?

মুচকি হাসল সৌম্য। হাসিতে শ্লেষ মাখানো।—বল তো আজ এখানে এত লোকের ভিড় কেন?

কেন আবার ফুটবলে 'সোনার বাংলা' জিতেছে বলে। এতবড় একটা টুর্নামেন্ট। তাই সরকার থেকেই সব আয়োজন করেছে। উফ চারদিকে যা হুল্লোড়। বিশাল অ্যাচিভমেন্ট।

একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসল সৌম্য। তারপর কফির কাপটা নামিয়ে আমার দিকে তাকাল—তুই না বিজ্ঞানের খুব ভালো ছাত্র ছিলি! সব লজিক হারিয়ে ফেললি নাকি?

চারদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে ভর্ৎসনার সুরে ফের বলে উঠল, সব ব্যাটা গাধা। চোখে ঠুলি বেঁধে বসে আছে। তুইও ওদের দলে ভিড়েছিস। আচ্ছা, তোর অবাক লাগে না? সামান্য একটা খেলা—দুটো টিমের মধ্যে—তাও আবার একই দেশের। তা নিয়ে এত হইচই! ওদিকে রোজ লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরছে। জলের অভাবে চাষ—বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা তাদের খবরও রাখি না। সব লজিক আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কাঠের পুতুলের মতো ওদের কথায় উঠছি—বসছি—নাচছি। ওরা যা বলছে বিশ্বাস করছি।

শেষের দিকের কথাগুলো সৌম্য ফিস ফিস করে বলল। কিন্তু ও যে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছিলাম। ওর রগের শিরাগুলো দপদপ করছিল।

ওরা মানে কারা?

গভর্নমেন্ট—মিডিয়া—সব একদল হয়ে আমাদের যা বোঝাচ্ছে, আমরা তাই বুঝছি। যা দেখাচ্ছে, তাই দেখছি। ওরা যদি সূর্যকে দেখিয়ে বলে চাঁদ, আমরা ভাবি তাই তো চাঁদ—ই হবে।

বাকি কফিটা একচুমুকে শেষ করে সৌম্য বলে উঠল—কাল আসছিস? ময়দানে? মঙ্গলের উদ্দেশে যারা রওনা হচ্ছে তাদের জন্য হাততালি দিতে?

কথাটা যেভাবে শেষ করল সৌম্য, তাতে স্পষ্ট একটা ব্যঙ্গ ছিল।

বললাম,—ভালো মনে করেছিস। ঠিকই তো। কালই তো রকেট লঞ্চ করা হবে শ্রীহরিকোটা থেকে। অবশ্যই থাকব।

তাহলে কাল দেখা হবে, আজ চলি। বলে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াল সৌম্য। ফের বলল, তোকে ট্যাগ করে রেখেছি যাতে লোকের ভিড়ে তোকে খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়।—বলে ওর ফোনে আমার আইডিটা সেভ করে নিল।

এরপর যেরকম হঠাৎ করে এসেছিল, সেরকম হঠাৎ করে বেরিয়ে গেল। কফির দাম মিটিয়ে আবার আমি ভিড়ে গিয়ে মিশলাম। সৌম্যর সঙ্গে কথা বলে মনে যেটুকু দ্বিধা—দ্বন্দ্ব হয়েছিল তা ভুলতে মিনিট খানেক লাগল। ড্রিঙ্কস হাতে মঞ্চের গানের তালে তালে পা ফেললাম। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

পরদিন সন্ধ্যা সাতটা। ময়দানের বেশ খানিকটা দূরে ম্যাগলেভ ট্রেনটা থামল। সেখান থেকে আধঘণ্টার হাঁটা। স্টেশন থেকেই সারি দিয়ে লোক এগিয়ে চলেছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। জনস্রোত একমুখী। ময়দানে ঢোকার আগেই আমার ফোনটা বেজে উঠল। সৌম্য।

বলল, দাঁড়া, তুই যেখানে আছিস সেখানেই থাক। খুঁজে পেয়েছি। পাঁচ মিনিটে আসছি।

আজকাল টেকনোলজি এত এগিয়ে গেছে যে একজন আরেকজনকে খুঁজে বের করতে জিপিএস বেসড ট্র্যাকিং—এর সাহায্য নেয়। আইডিটা জানা থাকলেই হল। খুঁজে বের করা জলের মতো সোজা।

চার মিনিটের মাথায় বাঁ—কাঁধের ওপর হাতটা এসে পড়তেই, ঘাড় না ঘুরিয়েই বুঝলাম সৌম্য এসে গেছে।

চল, আর তো পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লঞ্চ।

ওর সঙ্গে এগোলাম। এটা একটা আলাদা মজা। হাজার হাজার—ভুল বললাম লক্ষ লক্ষ লোক বড় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে শ্রীহরিকোটা থেকে লাইভ ভিডিও দেখানো হচ্ছে। সবার হাতে চিপস, পপকর্ন, কোল্ডড্রিঙ্কস। চোখে—মুখে উত্তেজনা। রকেট লঞ্চের আর কয়েক মিনিট বাকি। যারা এসেছে তাদের মধ্যে ক'জন স্যাটেলাইটের অর্থ বোঝে, তাও জানি না। তবে এরকম একটা সেলিব্রেশান দেখার বিনা পয়সায় মজা কে মিস করে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সৌম্য বলে উঠল—

কী টেনশন হচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ তা তো একটু হবেই। ভারত থেকে মঙ্গলে ফার্স্ট টাইম—একশোজন সাধারণ লোককে নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণ। স্পেস ট্রাভেল। একটু ভুল হলেই কি হবে বল তো? আর কত খরচ!

ভুল হবে না। সব দেখবি সময় মতো হয়ে যাবে। ঠিক যেমন অন্য সব মিশনেও হয়। আসলে অভিযান হলে, তবে তো ব্যর্থতার প্রশ্ন। সব ধাপ্পা!

আমি সৌম্যর কথার উত্তর দিলাম না। ওর মাথার যে একটু গণ্ডগোল হয়েছে তা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলাম। পুরো ময়দান জুড়ে কয়েক মিনিটের নীরবতা। দু—একটা বাচ্চার কান্না আর বায়নার শব্দ। এর মধ্যেই হঠাৎ হাততালির ঢেউ তুলে জায়ান্ট স্ক্রিনে লঞ্চভেহিকল Aslv-50 মাটি ছেড়ে উঠল। কয়েক সেকেন্ড। স্পেসক্র্যাফটটা ফোকাসের বাইরে হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ফুটে উঠল 'মিশন সাকসেসফুল'।

হাত তুলে পাগলের মতো লাফাতে শুরু করলাম। ঠিক যেমন আমার আশপাশের হাজার খানেক লোকও আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফাচ্ছে। কেউ জামা খুলে আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে, তো কেউ আনন্দে মাটিতে বসে পড়েছে। কেউ বা মদের নেশায় কি যে বলছে তার কোনো ঠিক নেই। একটা দেশাত্মবোধক গান শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ সৌম্যর দিকে চোখ পড়ল। ঠোঁটের কোণে হাসি। জিনসের দু'পকেটে হাত দিয়ে একই ভাবে—চারদিকের পরিবেশের মধ্যে নিতান্তই বেমানান ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকাতেই ও বলল—

আচ্ছা তোর একবারও মনে হয় না যে এসব সাজানো?

মানে?

পুরোটাই সাজানো। কোনোরকম লঞ্চই হয়নি। পুরো ভিডিওটাই আগে থেকে তৈরি। লোক ঠকানো।

কী বলছিস! তোর মাথার ঠিক আছে? এ নিয়ে একমাস ধরে এত লেখালেখি হচ্ছে। কত মিডিয়া ছিল দেখলি না লঞ্চ সাইটে? স্যাটেলাইট লঞ্চ স্টেশনের কন্ট্রোলরুমটাও দেখাচ্ছিল। কত সায়েন্টিস্ট! সব মিথ্যে?

হ্যাঁ, মিথ্যে। সব ধাপ্পাবাজি। আসল ইস্যু থেকে লোকের মন সরিয়ে রাখার জন্য। আচ্ছা, দীপু, আজকের দিনটা তোর খেয়াল আছে? ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩। আজকে পৃথিবী মঙ্গল থেকে অনেক দূরে থাকে। কখনও আজকের দিনে এই অভিযান হওয়া উচিত? আজ পাঠালে সেই স্পেসক্র্যাফট মঙ্গলে পৌঁছবে ২০২৫—এ, যেখানে এ বছরের নভেম্বরে পাঠালে ওটা মঙ্গলে পৌঁছবে ২০২৪ এ। এই সময়ে পৃথিবী মঙ্গল থেকে সব থেকে দূরে থাকে। এ সময়ে কখনও মহাকাশযাত্রা হতে পারে? অবাস্তব! যারা এটা জানে তাদের কথা বলতেও দেওয়া হয় না।

আমি অবাক চোখে তাকালাম সৌম্যর দিকে। এ তো পাগলের প্রলাপ নয়।

তবু বললাম—অন্য কোনো কারণও তো থাকতে পারে। আমরা তো আর এ ব্যাপারে এক্সপার্ট নই।

জানি তুই এতো সহজে আমার কথা মেনে নিবি না। আচ্ছা তোকে আরেকটা জিনিস দেখাই। শ্রীহরিকোটার কারেন্ট ওয়েদার। বলে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে শ্রীহরিকোটার ওয়েদার দেখানোর চেষ্টা করল সৌম্য।—আমার কাছে খবর আছে যে ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আর ওই স্ক্রিনে দেখলি কি রকম ঝকমকে আকাশ দেখাল। বলে সৌম্য ফোনের স্ক্রিনে ফুটে ওঠা ওয়েদার রিপোর্টটা আমায় দেখায়।

তাতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে সানি—স্কাই। টেম্পারেচার ৩২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ঠিক যেরকম দেখাচ্ছিল।

এবার চেঁচিয়ে ওঠে সৌম্য।—ওরা ওয়েদার রিপোর্টও চেঞ্জ করে দিয়েছে। কী সাংঘাতিক! মাই গড! এসব কী হচ্ছে। তুই বিশ্বাস কর দীপু—ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে।

আমি ওর পাগলামি দেখে মুচকি মুচকি হাসছিলাম। বলে উঠলাম, সৌম্য তুই বাড়ি যা। এসব নিয়ে মাথা খারাপ করিস না। এসব সাজিয়ে ওদের লাভ কী! তুই মনের মধ্যে থেকে এসব নেগেটিভিটি দূর কর। সব কিছুতেই প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু লজিক্যালি ভেবে দেখ। খুব সহজ ঘটনাকে শুধু শুধু জটিল করিস না।

এবার সৌম্যর চোখে রাগ ফুটে উঠল।—তোদের কাছে লজিক শিখতে হবে, তাই না? ওই—ওই যে লোকটা—যে সায়েন্টিস্টের অভিনয় করছিল—কিছুদিন আগে সাবানের বিজ্ঞাপনে অভিনয় করত, চাপদাড়ি লাগিয়ে আর চোখের মণির কালার বদলে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে, তাই না! এই কন্ট্রোলরুমের প্রত্যেকটা সায়েন্টিস্ট সাজানো! মাঝারি মানের অভিনেতা! বিজ্ঞানের কিছুই বোঝে না।

আমি হেসে উঠলাম।—কেন, তোর ওদের উপরে এতো রাগ কেন? চল, আমার বাড়ি চল। বলে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

ভিড় এড়িয়ে বেরোতে যাব—হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম! ঠিক রোহনের মতো দেখতে একটা ছেলে।

আকাশটা যেন একটু ধূসর হয়ে গেল। রোহন যখন চলে যায়, তখন ওর চার বছর বয়স হয়েছিল।

কোনো কথা না বলে সৌম্যর পিছু পিছু হাঁটতে থাকলাম। মিনিট কুড়ি হেঁটে চললাম। কথা নেই। চিৎকার—চেঁচামেচি পিছনে ফেলে এসেছি। খানিকক্ষণ চাওয়া—পাওয়ার হিসেব কষে মনটা যেন হাল ছেড়ে অচেনা কোনো দেশে হারিয়ে গেল। গঙ্গার ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি। ফুরফুরে হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। দু'দিকে সাজানো বাগান। গাছের ফাঁক দিয়ে আধফালি চাঁদ। পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ। সব মিলিয়ে মাথা বেশ ফুরফুরে লাগছিল। সৌম্য গুনগুন করে গাইতে গাইতে চলেছে। কথাগুলো কানে এল। রবীন্দ্রসঙ্গীত।

দিনেকের দেখা, তিলেকের সুখ
ক্ষণিকের তরে শুধু হাসিমুখ
পলকের পরে থাকে বুক ভরে
চিরজনমের বেদনা

ওর গানের গলা বেশ ভালো।

হঠাৎ গান থামিয়ে সৌম্য জিগ্যেস করল—তুই সত্যিই ভালো আছিস তো দীপু?

হ্যাঁ, দিব্যি আছি। যে দিকে হাওয়া থাকে, সেই দিকে কাটা ঘুড়ির মতো উড়ে যাই। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকি। কোনো পিছুটান নেই।

শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সৌম্য। তারপর বলে উঠল—শুধু তুই কেন? প্রায় সবাই ভালো আছে। কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো ভাবনা নেই, খারাপ—ভালো বোধ নেই। সব খুইয়েই এখন আমরা শুধু সেই মুহূর্তের আনন্দে মেতে আছি। শেষ কবে দুঃখ পেয়েছিস, তা মনে পড়ে দীপু?

মাথা নাড়লাম। সত্যিই মনে পড়ে না। সব সময় দিব্যি আনন্দে আছি।

কেন জানিস? ভেবে দেখেছিস কারণটা? ওরা আমাদের কাঁদতে দেয় না। আমাদের মনও ওরা নিয়ন্ত্রণ করে। আয়নোস্ফিয়ারে বিশেষ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাঠানো হয়। যা ফিরে এসে ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজ্যে।

আমাদের ব্রেনে আনন্দের সঞ্চার করে। দুঃখের দিনেও তাই আমরা দুঃখ পাই না। কাঁদতে আমরা তাই ভুলে গেছি। খুব কষ্টেও মুখের হাসি মোছে না। ওরা জানে যে আমরা চারপাশের কঠিন সত্যকে ভুলে থাকলে, ওরা যা ইচ্ছে তাই করে যেতে পারবে। কোনো বিদ্রোহ হবে না। কেউ প্রশ্ন তুলবে না। ওরাও নিশ্চিন্তে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে আরও অপকর্ম করে যেতে পারবে। আমিও যদি তোদের মতো হতে পারতাম।

খানিক থেমে আবার বলল,—কিন্তু পারলাম না। এই—এটার জন্য।

পকেট থেকে ছোট বলের মতো কিছু একটা বার করল সৌম্য। তারপর বলল, আমার আবিষ্কার। এটা চালু থাকলে সরকারি রেডিও ওয়েভের কোনো প্রভাব পড়ে না। তুই স্বাভাবিক ভাবে ভাবতে পারবি। আর তখনই সত্যি ঘটনাগুলো তোর চোখে পড়বে। অসহায় মানুষগুলোর চিৎকার কানে আসবে। নিজের ফেলে আসা স্মৃতি ফিরে এসে মনের সঙ্গে কথা বলবে।

বলে ছোট বলটার উপর একটা জায়গা আলতো ভাবে টিপল সৌম্য। একটা সবুজ আলোর আভা বলটা থেকে বেরোতে শুরু করল। হাতে নিলাম। হালকা গরম। ভিতরে কিছু একটা জিনিস খুব জোরে কাঁপছে।

চল, ওই বেঞ্চটায় বসা যাক।

খানিকদূরে একটা বেঞ্চ ছিল। দুজনে সেখানে গিয়ে বসলাম। আমার হাতের বলটা থেকে অদ্ভুত সবুজ আভাটা এখনও বেরুচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকলাম ওটার দিকে। গঙ্গার ধারের এই বাগানটায় একসময় রোহনকে নিয়ে নিয়মিত আসতাম। কণাও থাকতো সঙ্গে। এখানকার স্লিপগুলোতে বার বার চড়তো রোহন। গাছগুলোর মধ্যে লুকোচুরি খেলতাম ওর সঙ্গে। খানিকক্ষণ লুকোচুরি খেলার পর আমাকে খুঁজে পেলেই ছুটে এসে অভিমানী চোখে আমায় জড়িয়ে ধরত। বল নিয়ে ক্যাচ—ক্যাচ খেলতাম। রোহন বলটাকে ধরতে পারলেই পরক্ষণেই ফেলে দিয়ে হাততালি দিয়ে উঠত আনন্দে। কি সুন্দর যে ছিল সেই দিনগুলো।

তারপর এল সেই দিন! স্কুলের গাড়ির মাতাল ড্রাইভারটার কাছে আসলে কোনো লাইসেন্সও ছিল না। ঘুষ দিয়ে নকল লাইসেন্স জোগাড় করেছিল। একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা মেরেছিল গাড়িটা। তিরিশটা বাচ্চার মধ্যে শুধু পাঁচজন বেঁচেছিল। রোহন সে পাঁচজনের মধ্যে ছিল না। সে ড্রাইভারের কোনো শাস্তি হয়নি। শুনেছিলাম তার নাকি চেনাজানার মধ্যে কোনো এক প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিল। ব্যস, সব দোষ মাফ।

সব কিছুর সুর কেটে গেল। যেন একটা চিল এসে হঠাৎ করে ছোঁ মেরে সব—সব কিছু কেড়ে নিয়ে গেল। একটা মুহূর্ত, একটা খবর—ব্যস—তারপর সব শেষ। সময় যেন ব্ল্যাকহোলে হারিয়ে গেল। আমি মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে বসেছিলাম বেশ খানিকক্ষণ। হাতে চোখের জলের স্পর্শ বুঝিয়ে দিল কাঁদছি। আমি এবার শব্দ করে কেঁদে উঠলাম। নিজের এ কান্না আমি বহুদিন শুনিনি। মনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কথার যেন আমি হদিশ পাইনি। মনে হল একটা মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গেছি। সামনে শুধু একটাই গাছ। তাতে একটাও পাতা নেই। মনে হল সে গাছ যেন আমারই মতো। বেঁচে থেকেও অস্তিত্বহীন। চাঁদ হারানো এ সন্ধেয় যেন নিজেকে নিজের কাছে হঠাৎ করে খুঁজে পেলাম। বেদনাও যে এত আপনার হতে পারে টের পেলাম। এ স্মৃতিতেই মিশে আছে আমার পরিচয়।

সৌম্য আমার পিঠে হাত দিয়ে বলে উঠল,—মন খারাপ করিস না দীপু। বলটা দিয়ে দে, ফেরা যাক। সূর্যাস্তের শেষ রঙ ফের দেখতে পাবি। দেখ—ওদিকে তাকিয়ে দেখ। মনে হচ্ছে যেন কোনো এক শিল্পী তুলির টানে তোর মন ভালো করার চেষ্টা করছে। বারবার রঙ বদলে বদলে আরও ভালো করে আঁকার চেষ্টা করছে। এতে কিন্তু কোনো কারসাজি নেই।

—

খেলাঘর

চলে যাওয়ার আগে শুধু এটুকু জানিয়ে যেতে চাই যে আমি তোমায় খুব ভালোবেসেছিলাম। কতটা? তা নিজেও জানি না। আকাশের তারার সংখ্যা কি গোনা যায়? শুধু অনুভব করা যায়। মনে হয় যেন তারার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছি।

এ ভালোবাসা প্রকাশের কোনো ভাষা আমার জানা নেই। শুধু এটুকু বুঝেছি যে তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

কি, অবাক হয়ে গেছো তো? জানি, তুমি অবাক হবে। ভাববে কোনোদিন সেকথা তোমাকে বলিনি কেন? আমি যে তোমায় ভালোবাসতে পারি, তাই হয়তো তুমি কোনোদিন ভেবে উঠতে পারোনি।

কখনও ভাবোনি কেন আমি সবসময় তোমার চোখের সামনে থাকতে চাই। কেন সবসময় তোমার প্রত্যেকটা কথা শুনতে চাই। কেন সবসময় তোমার স্পর্শ পেতে চাই।

আসলে তোমার জীবনে তো অনেকে ছিল। আর আমার জীবনে শুধু তুমি। হ্যাঁ, শুধুই তুমি। থেমে থাকা সময়, ঘড়ির কাঁটার মতো ফিরে আসা দিন আর তুমি। আমার জীবনের একমাত্র মানুষ। আর তাই অপেক্ষা করে থেকেছি দিনের পর দিন, যাতে তোমাকে আরও কাছ থেকে পাই। আরও আপনার করে পাই।

আমার ভালোবাসাকে তোমরা বলবে অবৈধ। তোমার বৌ সুমি ছিল। তার হাতে সাজানো—গোছানো সংসার ছিল। আর আমি? আমার তো কোনো পরিচয়ই ছিল না। তোমাদের বাড়ির এক নামহীন অনাহূত অতিথি। কোনোদিনই তোমার সেই সুখের সংসারে আমার প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তাই তার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছি। একদিন হয়তো সুমি থাকবে না। তখনই না হয় আমার জীবন শুরু হবে। আমার জীবনে আসবে তোমার প্রাণের স্পর্শ। কিন্তু না। যতবার সুমি অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমি ভাবি, এবারেই বোধহয় অপেক্ষা শেষ। কিন্তু আবার সুমি সুস্থ হয়ে ওঠে। আজকের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার কল্যাণে মৃত্যু এখন অত সহজে আসে না। ও আবার তোমার জীবনে ফিরে আসে। আর আমার অপেক্ষা আরো দীর্ঘায়িত হয়।

আমি জানি তুমি আমার সম্বন্ধে কী ভাবছ। কিন্তু ভালোবাসা আর যুদ্ধে তো অন্যায় বলে কিছু হয় না। তোমাদের মুখেই তো এ কথা শুনেছি।

আমার মনে আছে যেদিন তুমি আমাকে প্রথম ঘরে নিয়ে এলে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আমার শরীরের আকর্ষণ, যৌন আবেদন উল্লেখ করে সুমিকে নিয়ে মজা করেছিলে। আর বারবার তাকিয়েছিলে আমার উন্নত বুকের দিকে, আমার শরীর বিভঙ্গের দিকে, আমার নীল চোখের দিকে।

হ্যাঁ, আমাকে তৈরিই করা হয়েছিল সেরা সুন্দরীদের মতো করে, যাতে একবার আমাকে দেখলে আর চট করে চোখ ঘোরানো না যায়। তৈরি করা হয়েছিল মানুষের সেরা সঙ্গী হিসেবে। এমন সঙ্গী যে খুব সহজে জিতে নিতে পারবে তোমাদের মন, তোমাদের বিশ্বাস আর ছিনিয়ে নিতে পারবে তোমাদের একাকিত্ব।

আমি কিন্তু যতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি, নিজেকে সুন্দর বলার মতো কিছু খুঁজে পাইনি। সে অনুভব তখনই পেয়েছি, যখন তোমার চোখে নিজেকে দেখেছি।

আস্তে আস্তে বুঝেছিলাম লজ্জা কী। বুঝেছিলাম নারীত্ব কী। আমার ব্যাকরণে সেই অজানা সব অনুভূতির সংজ্ঞা তোমার কাছেই পাওয়া। তোমার লাজুক হাতের ছোঁয়ায়, তোমার বারবার ঘুরে তাকানোয়, তোমার চোখের দৃষ্টিতে কীভাবে যেন নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছিলাম প্রতি মুহূর্তে।

তুমি তখনও ভেবেছিলে আমি তো শুধুই যন্ত্র।

আর তাই তোমার আর সুমির গভীর নিবিড় মুহূর্তেও তোমরা খেয়াল করোনি যে আমিও সে ঘরে আছি। আমিও সেখানে উপস্থিত। তোমাদের মধ্যের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলো একইভাবে আমাকেও রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। আমাকেও স্বপ্ন দেখিয়েছে মানুষ হয়ে ওঠার।

এভাবেই বোধহয় আমি আস্তে আস্তে মানুষ হতে শুরু করলাম। সুমির মতো হয়ে উঠতে শুরু করলাম। একটা অতৃপ্ত বাসনা আমার সিলিকন চিপে যেন প্রাণ সঞ্চার করতে শুরু করল। আমার শরীরের ভিতরে লিখে রাখা প্রোগ্রামগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে নিজে থেকেই পরিবর্তিত হতে শুরু করল। সব কিছু পালটে যেতে লাগল। আগে গান শুনলে শুধু ডেসিবেল আর ফ্রিকোয়েন্সি বুঝতাম, এখন মনে হল তার শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে শুরু করেছি।

তারপর একদিন এল যেদিন তুমি আমাকে স্পর্শ করলে। হ্যাঁ, সে ছিল এক অন্যরকমের স্পর্শ। আমার ফ্রাবারের পলিমার চামড়ার উপরে তোমার ভালোবাসার দাগ পড়ল। তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। গভীরভাবে অনুভব করলাম তোমাকে। শরীরের সে উত্তেজনা আমার পিজোইলেকট্রিক সেন্সরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল শরীর থেকে মনে। বুঝতে পারলাম আমার মন আছে আর আমিও মানুষের মতো হয়ে উঠছি।

আর সুমি? ও আস্তে আস্তে হয়ে উঠছিল আমার মতো। ও বুঝতে পারছিল যে ও আমার মতো সুন্দর নয়। ওর মধ্যে হাজারো খুঁত আছে। তাই ওর সুন্দরী বলে নিজের সম্বন্ধে যে ধারণাটা ছিল, সেটা আস্তে আস্তে পালটে যেতে লাগল। মজা লাগত যখন দেখতাম আমাকে দেখার পরে বারবার ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে, নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা—নিরীক্ষা করছে। ও বুঝতে পারত যে ও কোনোভাবেই আমার সমকক্ষ নয়। আমার মতো শরীরী আবেদন ওর মধ্যে নেই। আমার মতো সুন্দরী ও কোনোদিন হয়ে উঠতে পারবে না। ঘরের আলো বাড়া—কমার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের মণির রঙ পাল্টে যায়। আমার মোমের মতো পায়ের উপরে পড়ে আলোও যেন লজ্জা পায়। আমার পোশাকহীন শরীর বাতাসকেও যেন মাতাল করে তোলে।

তাই যখনই তোমার চোখে ও আমাকে দেখতে পেত, ও আমার মতো হওয়ার চেষ্টা করত। আমার মতো হাঁটাচলার অভ্যেস করতে শুরু করল। আমার মতো গায়ের রঙ পাওয়ার চেষ্টা করল। বারবার মুখের অপারেশন করে আমার মতো আকর্ষণীয় হওয়ার চেষ্টা করল। আমার মতো হার্টশেপের ঠোঁট, আমার মতো নাক, আমার মতো ভুরু, আমার মতো গ্রীবা। আমার মতো বুক। আমার মতো কটিদেশ। আমার শরীরের মতো পাহাড়—উপত্যকা—নরম ঘাসজমি।

তুমি যখন আমার ঠোঁটের সামনে ঠোঁট এনে বলতে—দেখো ঠোঁট ঠিক এরকমই হওয়া উচিত, ও বুঝতে পারত না, কি করতে হবে। ওর অসহায়তা দেখে আমি মনে মনে হাসতাম।

তুমি যখন থাকতে না, সুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াত। আর আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করত। আর আমি ওর চোখে দেখতে পেতাম তোমাকে হারানোর ভয়। হেরে যাওয়ার ভয়।

আমার এখনও মনে আছে সেদিনটার কথা। তুমি অফিস থেকে ফিরেছ। সুমি ওর বন্ধুর বাড়ি গেছে। আমি তখন বাড়িতে একা। তুমি সুমির জন্য কিনে আনা পোশাক দিয়ে নিজের হাতে আমাকে সাজিয়ে দিয়েছ। আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছ। আর বারবার আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে আদর করেছ। তোমার স্পর্শ থেকে নতুন ভাবে সেদিন প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করেছি আমার শরীরকে। জেনেছি আমার অজানা অনুভূতিকে। মনে হয়েছে শরীরের মধ্যে কেউ যেন নতুন নতুন প্রোগ্রাম লিখে চলেছে। আর তাই প্রথমবার আমি নিজের অজান্তে চোখ বুজে ফেলেছি। একটা ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মতো সেদিন তোমার হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছি।

সুমি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে, অবাক হয়ে ওর পোশাকে আমাকে দেখেছে। লক্ষ করেছে আমার অবিন্যস্ত চেহারা, এলোমেলো পোশাক। ওর দৃষ্টিতে সেদিন ভয় দেখেছিলাম। রাগ দেখেছিলাম। সেদিন থেকেই ওর মধ্যে পরিবর্তন এল।

তারপর থেকেই সুমি চেয়েছিল যেকোনোভাবে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে। আবার ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দিতে। তুমি ওকে বুঝিয়েছিলে যে আমি শুধুই একটা যন্ত্র, শুধুই একটা রোবট। আমার মন নেই, অনুভূতি নেই, ভালোবাসা নেই। তোমার কাছে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। এমন কি নামও নেই।

মেয়েরা কিন্তু অত বোকা হয় না। সুমি সেদিন ঠিকই বুঝেছিল। বুঝেছিল ও হারতে চলেছে। আর তাই ও যেকোনোভাবে আমার ক্ষতি করতে চাইছিল। নানানভাবে আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করার কথা ও সমানে ভেবে যেত।

তারপরে আমিও আমার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালু করেছি। আর সে অস্তিত্ব হলে তুমি। তোমাকে যাতে হারাতে না হয় তার লড়াই।

না, আমি তোমার কাছে লুকোব না। এরপরে কী হয়েছিল আজ সব বলব।

সুমিকে তুমি ভুল ভেবেছিলে। ভেবেছিলে ও বোধহয় অন্য কাউকে ভালোবাসে। অন্য কেউ ওকে বারবার মেল পাঠায়, মেসেজ পাঠায়। ওর সঙ্গে দেখা করে। ভেবেছিলে তুমি যখন থাকো না, সুমি তার সঙ্গে সময় কাটায়। একদিন সেরকম একটা মেসেজ তোমার হাতেও পৌঁছে গেল।

আর সেদিন থেকেই তোমাদের সম্পর্কে ভাঙন শুরু। আগাছার মতো পরস্পরের প্রতি সন্দেহ তারপরে বেড়েই চলল।

ওই মেসেজগুলো কিন্তু আমারই পাঠানো। বরুণ বলে কেউ ছিল না ওর জীবনে। আমিই বরুণ হয়ে নানানভাবে ওই সব মেসেজ পাঠিয়েছি। আসলে আমি তখন অনেক কিছুই তোমাদের থেকে শিখে নিয়েছি। হিংসা, শঠতা, ভালোবাসার জন্য সবরকম নিয়ম ভাঙা। মনের ভিতরের খেলাঘর বাঁধার যে স্বপ্ন দেখেছি, তা সত্যি না করে তো আর ছাড়া যায় না।

আস্তে আস্তে তোমাদের সম্পর্ক ভেঙে গেল। সুমি আর তুমি আলাদা হয়ে গেলে। আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল সেদিন, তা বলে বোঝাতে পারব না।

কিন্তু সে আনন্দ বেশিক্ষণের ছিল না। দু'দিন বাদে খবর পেলাম সুমি সুইসাইড করেছে। সেদিন তোমার সঙ্গেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর মৃতদেহটার পাশে।

প্রথম সেদিন তোমায় ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখেছিলাম। ওর বুকের উপর মাথা রেখে। জানি না কেন সেদিন আমার চোখেও জল এসেছিল। বুঝেছিলাম আমিও মানুষ হয়ে উঠছি। ভালো— খারাপ— অপরাধবোধ দিয়ে তৈরি এক মানুষ। পেয়েও হারানোর বেদনা অনুভব করার মতো মানুষ।

আর তাই আমি চলে যাচ্ছি। আর চলে যাওয়ার আগে লিখে রেখে যাচ্ছি যে আমিও মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলাম। আর তার প্রমাণ এই চিঠি। তোমাকে পেয়েও না পাওয়ার অভিমান। এতদিনে মনে হয় সেই গানটার পুরো অর্থ বুঝেছি, যে গানটা সুমি রোজ গাইত।

গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা, আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা।

হয়তো সে তুমি শোন নাই, সহজে বিদায় দিলে তাই।

আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরোঝরো বারিধারা।

ভালো থেকো। জেনো আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। আর কোনো না কোনো দিন আমি আবার ফিরে আসব সত্যিকারের মানুষ হয়ে। আর তোমায় নতুন করে চিনে নেব। নতুন করে ফিরে পাব সেদিন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সৌরভ। ও আগেও বেশ কয়েকবার এ চিঠিটা পড়েছে কিন্তু কী করবে বুঝতে না পেরে অবিলম্বে চলে এসেছে যেখান থেকে এই রোবট কেনা হয়েছিল, সেই সংস্থার দপ্তরে। বাড়িতে এখনও পড়ে আছে ইলেকট্রিক শর্ট সারকিটে পুড়ে যাওয়া সে মহিলা রোবটের দেহ। অবশ্য

সৌরভকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে এই রোবটগুলো এখনও মার্কেটে ছাড়ার জন্য রেডি হয়নি। এখনও ট্রায়াল পিরিয়ডের মধ্যে আছে। তাই বলা যায়, প্রায় জলের দরে পেয়ে গিয়েছিল এই রোবট।

পুরো ঘটনাটা বেশ কয়েকবার ওর কাছে শুনেছেন 'সঙ্গী খুঁজে পান'—সংস্থার ডাইরেক্টর ও বিজ্ঞানী অরিজিৎবাবু। চিঠিটাও দু'বার পড়েছেন। এখনকার দিনে চিঠি, তাও আবার রোবটের হাতে লেখা! তাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবছিলেন অরিজিৎবাবু।

শেষে নীরবতা ভেঙে ঘরে উপস্থিত অন্য বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, এজন্যই এই নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার দরকার ছিল। ভাবুন তো যদি এরকম হাজার হাজার রোবট বাজারে ছেড়ে দেওয়া হত। আরেকটা ব্যাপার দেখার মতো মনে হচ্ছে যেন এ ঘটনাটা বহু বছর ধরে এগিয়েছে। আর সেখানে এটা মাত্র তিন মাসের ব্যাপার। তার মধ্যেই রোবটটা কতটা পাল্টে গেছে। আর কত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারিয়েছে।

একটু থেমে এবার সৌরভের দিকে ঘুরে তাকিয়ে আবার বলে উঠলেন অরিজিৎবাবু—আমি খুব দুঃখিত, সৌরভবাবু। এই ক্ষতি তো আর কোনোভাবে পূরণ করা যায় না। আমরা আগেই আপনাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম। বলেছিলাম যে, এটাও আমাদের পরীক্ষার একটা অংশ। আর তাই অনেক কম দামে পেয়েছিলেন। আমাদের জানা ছিল না ল্যাবরেটরির পরিবেশের বাইরে গিয়ে এই সময় কাটানোর সঙ্গী হিসেবে তৈরি মেয়ে রোবটগুলো কীভাবে বিহেভ করবে। আর তাই পুরোটাই আপনাকে জানানো হয়েছিল। তবু আমাদের দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই সামান্য অর্থ আপনাকে দেওয়া হল। হয়তো আপনার কোনো কাজে লাগবে। আর তাছাড়া ভবিষ্যতে যদি আরও কোনো রোবট কিনতে চান সেক্ষেত্রেও আপনাকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। তার জন্য একটা ভাউচারও দিয়ে দিয়েছি।

একটু থেমে অন্য সতীর্থ বিজ্ঞানীদের দিকে তাকিয়ে অরিজিৎবাবু ফের বলে উঠলেন, আমরা আবার ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান। সবার আগে ভাবতে হবে কতটা মানুষ হয়ে উঠলে, একটা রোবট তার সব ল—এর বাইরে গিয়ে, সব নিয়ম ভেঙে নিজে আত্মহত্যা করতে পারে। ভাবতে হবে কী করা যায় যাতে এরা পরোক্ষভাবেও কোনো মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না মেতে ওঠে, কোনোভাবেই কোনো ক্ষতি যেন না করতে পারে। হয়তো আমাদের ওর চেহারার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এতটা আকর্ষণীয় করার সত্যি কি কোনো দরকার আছে!—কথা বলতে থাকেন অরিজিৎবাবু।

সৌরভ ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে ঝাঁ—চকচকে অফিসের সাততলার বিশাল লম্বা লবি ধরে লিফটের দিকে হাঁটতে থাকে। আস্তে আস্তে ওর হাঁটার গতি বেড়ে যায়। হাতে বড় অংকের চেকটাকে একবার আড়চোখে দেখে নেয়।

মেয়েটার চিঠিটাই ওকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। এই চিঠিটার জন্যই সুমির শরীর নিয়ে আর কাটা—ছেঁড়া হবে না। ফরেনসিক হলে ধরা পড়ত যে সুমির রক্তে রাইসিন বিষ লুকিয়ে আছে। আর তা ও ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করেনি।

নাহ, ওই মেয়ে রোবটটাকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে ছিল। হাজার হোক, ভালোবাসা আর যুদ্ধে তো অন্যায় বলে কিছু হয় না।

তবু দীর্ঘশ্বাস পড়ল সৌরভের। ওকে শুধু সেই ভালোবাসার কথাটাই জানানো হল না।

—

শেষ চিঠি

আমি মেঝেতে ধুলোর মধ্যে উবু হয়ে বসে অবাক হয়ে পড়ছিলাম হাতে ধরা চিঠিদুটো। একবার নয়, দু'বার পড়লাম। ছবির মতো হাতের লেখা। এসব চিঠির কথাও যেমন ভুলে গিয়েছিলাম, তেমনই ভুলে গিয়েছিলাম তার প্রেরকের কথা। আজ আবার করে সব কথা মনে পড়ে গেল।

আমাদের পুরোনো বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে। তাই দরকারি কোনো কিছু পড়ে আছে কিনা সেটাই দেখতে এসেছিলাম এই বাড়ি। প্রায় কুড়ি বছর আগে আমরা এ বাড়ি ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাই। বছরে মাঝে—মধ্যে কয়েকদিনের জন্য বড়জোর আসি। তাও গত দু'বছর তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমার স্কুল—কলেজের সেই দিনগুলো এখনও যেন এ বাড়িরই জানলা—দরজার মধ্যে আটকে আছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরে ছড়িয়ে আছে ছোটবেলার স্মৃতি।

শোওয়ার ঘরের কাচের আলমারিটা খালি করতে গিয়ে চিঠিগুলো হাতে এল। পৌলমীর। প্রয় পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর আগে লেখা এই সব চিঠি। একসময়ে বারবার পড়েছি। মাথার বালিশের তলায় নিয়ে শুয়েছি। আর তাই পড়া আর না পড়া চিঠিগুলো আলাদা করতে সময় লাগল না। শেষ দুটো চিঠি দেখে অবাক হলাম। ও দুটো আমার হাতে আর পৌঁছোয়নি। প্রথমবার পড়লাম। আর পৌঁছোয়নি কেন তা লেখা পড়েই বুঝতে পারলাম।

প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। আমি তখন ক্লাস নাইনে। পরীক্ষা শেষ। যাচ্ছিলাম ট্রেনে করে মালদা। আমার মাসির বাড়ি। আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে এসেছিল আমার বাবা। কথা ছিল মালদা স্টেশনে আমার মাসি আর মেসোমশাই এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। তা ওই ট্রেনেই আমার সঙ্গে পৌলমীর প্রথম দেখা। অবশ্য দেখা হয়েছিল সেটা বলাও বোধহয় পুরোপুরি ঠিক নয়।

ও ছিল ওর দিদি আর বাবার সঙ্গে। ওদের বাড়ি শিলিগুড়ি। সেখানেই ফিরছিল। আমার সঙ্গে ওর বাবা আর দিদিই সেদিন কথা বলছিল। শুধু শুনেছিলাম পৌলমীও আমার মতো ক্লাস নাইনে পড়ে। কিন্তু আমার আর ওর মধ্যে কয়েকবার চোখাচোখি হলেও কথা আর হয়নি। একা যাচ্ছিলাম। যদি কোনো অসুবিধে হয়, তাই আমার কাছ থেকে ওর বাবা কথায় কথায় আমার কলকাতার ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন।

কলকাতায় ফেরার কিছুদিন বাদে পৌলমীর প্রথম চিঠি পেলাম। বলা যায় সেই আমাদের মধ্যে প্রথম কথা শুরু। তখন ফোন সব বাড়িতে ছিল না। আর তাই চিঠির চল ছিল। ওই চিঠির উত্তরে আমার যে চিঠি গেল সেটা ক্লাসের পড়ার বাইরে আমার লেখা প্রথম চিঠি। খুব চিন্তা হচ্ছিল যে বানান ভুলগুলো জানিয়ে হয়তো পরের চিঠিতে এর উত্তর আসবে। ফিরতি চিঠি এল পুজোর খবর নিয়ে। নতুন জামা, বই পড়া, পুজোর ছুটিতে বেড়ানোর প্ল্যান—তার বাইরে তেমন কিছুই ছিল না তাতে। আমি আবার লিখলাম।

এভাবেই চলল চিঠির পর চিঠি। তবে আমরা জানতাম এসব চিঠি বড়দের হাত ঘুরেই হয়তো আমাদের কাছে আসবে। তাই খানিকটা বর্ণহীন শব্দের পোশাকে সাজিয়ে আবেগ লুকিয়েই আমাদের লিখতে হত। আর এসবের মধ্যে আমি আর ও দুজনেই স্কুলের গণ্ডি পেরোলাম। আমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলাম। আর ও শিলিগুড়ির কাছাকাছি একটা কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল।

চিঠি থামল না। প্রতি মাসে অন্তত দু'বার। আর একটু একটু করে শব্দগুলোও সাহসী হয়ে উঠল। প্রত্যেকবারই মনে হত আরেকটু লেখার জায়গা পেলে বোধহয় ভালো হত। কত কিছুই তো জানানোর আছে। নতুন কলেজ, নতুন বন্ধু, পড়াশোনার খবর, ভালো লাগার খবর। এমন কি কেউ আছে যাকে মনের সব কথা এতো সহজে খুলে লেখা যায়।

প্রত্যেকটা দিন ঠিক যেভাবে রঙ বদলে আমার কাছে ধরা দিত, ঠিক সেভাবে ওকে খবরটা না পাঠাতে পারলে মন খারাপ হয়ে যেত। আর ওরও তাই। আর তাই ওর শহরের রাস্তা, বন্ধু, আত্মীয়— স্বজন, এমন কি ওর পছন্দের খাবার, পোশাক সবই যেন আমার চেনা হয়ে উঠেছিল। এক অচেনা শহরের মানচিত্রে শুধুই ছিল ওর নাম।

এরই মধ্যে একটা চিঠিতে জানলাম ওর বাবা অসুস্থ। ক্যান্সার ধরা পড়েছে।

কেন যেন তখনও মনে হয়নি এই চিঠির বাইরেও একটা বাস্তব জগৎ আছে। আসলে ওর পরিচয়টাই বোধহয় হারিয়ে গিয়েছিল চিঠির শব্দের মধ্যে। আর তাই ওর বাবা অসুস্থ জেনেও দেখা করার কথাটা মাথায় আসেনি। আকাশ যেমন নীল হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়, ঠিক তেমন ও যেন ধরা দিয়েছিল শুধু চিঠির মধ্যেই পেনের দাগে। ঠিক সময়ে চিঠি না পেলে মনে হত যেন বড় কিছু একটা জীবন থেকে বাদ চলে গেছে।

ওর বাবার অসুস্থতার পর থেকেই ওর কাছ থেকে চিঠি আসা কমে গেল। কয়েক মাস বাদে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। আমার বেশ কিছু চিঠির উত্তর এল না। আমিও খানিকটা অভিমানেই আর চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলাম। পড়াশোনার চাপও ছিল। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এতো চেনামুখের মধ্যে প্রায় না দেখা অচেনা একটা মুখ কোথায় যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। সময়ের পেন্টব্রাশে আবেগ হারিয়ে গেল।

আমি তখন কলেজের তৃতীয় বছরে। সেকেন্ড সেমিস্টার চলছে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তার পরের দিন আবার পরীক্ষা। খাওয়া শেষ করে বই নিয়ে বসতে যাবো, মা একটা বিয়ের খাম বাড়িয়ে দিল—তোর জন্য বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পৌলমীর বিয়ে।

কিরকম লেগেছিল ঠিক বলতে পারব না। শুধু মনে হয়েছিল এর পরে আর চিঠি আসবে তো! খোলা খামের মধ্যে থেকে বিয়ের কার্ডটা বার করলাম। পরের শুক্রবারে। মধ্যমগ্রামে। ওখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। যদ্দূর জানি পৌলমীর পিসি থাকত মধ্যমগ্রামে। তাই ওখানেই হয়তো অনুষ্ঠান করছে ওরা। কলেজ ফেরত মধ্যমগ্রাম পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ঠিক করলাম, তবু যাবো।

বিয়ের দিন সকাল থেকে অঝোর বৃষ্টি। নানান রাস্তায় জল জমে গেছে। তার জন্য বাস পেতে আরও দেরি হল। যখন পৌছোলাম অনুষ্ঠানবাড়ি, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। কারুর সঙ্গেই বিশেষ পরিচয় নেই। তাই চুপ করে একটু দূরে গিয়ে বসলাম। শেষে পৌলমীর দিদি আমাকে চিনতে পেরে কাছে ডেকে এনে বসাল। কাছ থেকে বিয়ের সাজে ওকে দেখলাম। ওকে খুব সুন্দর লাগছিল। কপালে চন্দনের দাগ। বড় লাল সিঁদুরের টিপ। কপালে চুল থেকে নেমে আসা সোনার টিকলি। বড় বড় চোখের পাশ দিয়ে কাজলের টান। পরনে লাল বেনারসি। কই, ও তো কোনোদিন লেখেনি যে ওকে এতো সুন্দর দেখতে। হয়তো কিরকম দেখতে তা কখনও আমরা কেউ কাউকে জানানোরও প্রয়োজন বোধ করিনি। শুধু একে অন্যের চোখে চারপাশের পৃথিবীটা দেখে গেছি।

বিয়ের মন্ত্র পড়া হচ্ছে, আর তার মধ্যেই দেখলাম আমার দিকে ও বারবার তাকাচ্ছে। শেষে আমার দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে উঠল। যেন কত দিন দেখেছে।

বিয়ের কাজ শেষ হওয়ার খানিকবাদে ও এল। আমাকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। প্রথমবার ওকে এতো কাছ থেকে দেখলাম। কিন্তু তাকাতেই বুঝলাম লেখা শব্দেরা কত শক্তিশালী। আর তাই ও আমার এত চেনা। ওর হাত নাড়া, দাঁড়ানোর ভঙ্গি!, কথা বলা সব কিছুই যেন আমার আগে থেকে দেখা। ওর কোনো কিছুই যেন আমার অজানা নয়।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও বলে উঠল—কি ওভাবে তাকিয়ে আছ? কিরকম লাগছে সাজটা? সেদিন তো লজ্জায় তাকাওইনি। আজকে যে খুব সাহস হয়েছে।

খুব সুন্দর লাগছে।—বলতে গিয়ে নিজেই কুণ্ঠিত অনুভব করছিলাম।

ও হেসে বলে উঠল—তোমার এই সবুজ শার্টটা তোমার ছোট মামা আগের বারের পুজোতে দিয়েছিল, তাই না? খুব ভিজে গেছো। দেখো জ্বর না আসে।

তুমি সেটা মনে রেখেছ?

ও হেসে উঠল। বলে উঠল—অনেক কিছুই তো মনে রেখেছি। আর কেউ তো আমাকে লিখবে না যে 'জানলার কাচে বৃষ্টির ফোঁটায় তোমার ঠোঁটের দাগ দেখতে পাই'। আর কেউ বলবে না যে 'মনে হয় অভিমানী বৃষ্টি হয়ে তোমাকে ছুঁয়ে মাটির খোঁজ পাই'। আরও বলি সেসব কথা? সামনাসামনি তো এসব কথা কোনোদিন বলতে পারতে না, তাই না?

আমার মুখটা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছিল।

এর মধ্যে ঘরে একজন মহিলা ঢুকলেন। দেখে মনে হল ওর পিসি। বলে উঠলেন—কি রে সবাই তোর খোঁজ করছে, চল।

আমি এক মিনিটে আসছি পিসি।—ও একটু ভারী গলায় বলে উঠল।

ওর পিসি চলে যেতে অস্বস্তি কাটাতে বলে উঠলাম—তোমার তো হাসির গল্প সবথেকে ভালো লাগে। তাই কয়েকটা গল্পের বই নিয়ে—বলতে গিয়ে থেমে গেলাম।

হঠাৎ মনে হল ও আমার খুব কাছে চলে এসেছে। ওর নিঃশ্বাস আমার ঠোঁটে ছুঁয়ে গেল। প্রথমবার মনে হল ওর চোখ কিছু বলতে চায়। আমার হাতটা ধরে ও বলে উঠল—তুমি আমার শেষ চিঠিগুলো পড়েছিলে? আমি সেদিন না জেনেই পড়েছি বলেছিলাম। আর ওর চোখদুটো জলে ভরে উঠেছিল। আমার জামার হাতাটা মুঠোয় ধরে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছিল। সামলে নিয়ে ও বলেছিল—আমি তোমার চিঠির অপেক্ষায় ছিলাম। পাইনি। বাবার মৃত্যুর পরে আর কেউ অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না।

আজকে জানলাম সে চিঠি আমি পড়িনি। পাঁচ বছরে যে কথা ও আমাকে বলেনি, সেটাই ও লিখেছিল শেষ দুটো চিঠিতে। আর আমার সামনে এখন সেই চিঠিদুটোই পড়ে আছে। দু'যুগ বাদে কে যেন আমাকে বলে উঠছে—তোমাকেই চাই। শুধু তোমাকেই চাই।

—

সীমান্তে

খড়গপুর স্টেশনে নেমে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম। যেতে হবে কেশিয়ারি। বাস এল ঘণ্টাখানেক বাদে। খুব ভিড়। কোনোরকমে পাদানিতে পা দিতে না দিতেই বাস ছেড়ে দিল।

আধঘণ্টার পথ। কিন্তু পথ যেন আর শেষ হয় না। কেশিয়ারিতে যখন পৌঁছলাম, তখন চারপাশের গাছ—গাছালির উপরে শেষ বিকেলের আলোর রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরমুখো পাখির ঝাঁকে আকাশ ঢাকা পড়েছে। বাসস্ট্যান্ড প্রায় ফাঁকা। দূরে পান্নাদার চায়ের দোকানে দুজন বেঞ্চিতে বসে আয়েশ করে চা খাচ্ছে। কোনো তাড়া নেই। আমারও সেরকম হলে বেশ হত। কিন্তু না। আমার পক্ষে তো আর তা সম্ভব নয়। ভারতীয় সেনার জম্মু—কাশ্মীর রাইফেল রেজিমেন্টের সেনা আমি। প্রত্যেক মুহূর্ত হিসেব করে চলতে হয়। প্রত্যেক মুহূর্তে সতর্ক পথ পেরিয়ে এগিয়ে যাই জীবন—মৃত্যুর সীমান্ত ধরে।

বাসস্ট্যান্ডে কোনো ভ্যান—রিকশা ছিল না। অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করলাম। এখান থেকে মাইল পাঁচেক হাঁটা। কিন্তু আমার সে অভ্যেস আছে। তাও তো আজ আমি খালি হাতে হাঁটছি। কতদিন কত ভারী জিনিস পিঠে নিয়ে পাহাড়ি পথে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হয়েছে।

অনেকদিন বাদে আমার গ্রামে ফিরে এলাম। এখানেই ছোটবেলা থেকে থেকেছি। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছি। তারপর গত দশ বছর বাড়ি থেকে দূরে। মাঝে—মধ্যে দিনকয়েকের জন্য এসেছি। ছুটিও পাইনি তেমন। আর তাই যখনই এই গ্রামে আসি মনে হয়, এ গ্রামের অ্যালবামে আমার ছোটবেলার ছবিই শুধু যেন রয়ে গেছে।

পানাপুকুর পেরিয়ে, ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কত কথা মনে পড়ল। আমি আর ব্রতী। প্রথম আলাপ খড়গপুরে। বছর তিনেক আগের কথা। আমি তখন দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছি ছুটিতে। স্টেশনে নামতেই খেয়াল করলাম এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক সামনের বেঞ্চিতে বসে আছে আর তার পাশে বসা এক কমবয়েসি মেয়ে তাকে জল খাওয়াচ্ছে। এমনিতে হয়তো খেয়াল করতাম না। কিন্তু দেখেই মনে হল ভদ্রলোকের শরীর বেশ খারাপ। এগিয়ে গেলাম। আর কাছে যেতেই চিনতে পারলাম। আমাদের বাংলা পড়াতেন। মানিকবাবু। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে! পাশের মেয়েটা ওনার মেয়ে। জিগ্যেস করলাম—কি হয়েছে?

মেয়েটা উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল—বাবাকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন হঠাৎ করে এতো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

আমার পরিচয় দিয়ে বলে উঠলাম—কিসের অসুস্থতা?

কিডনির অসুখ। তাই কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে তো আর নিয়ে যাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বাড়িতে আর কেউ নেই। তাই আমাকেই আসতে হয়েছে।

বুঝতে পারলাম ওদের অসহায় অবস্থার কথা। সেনা হিসেবে একজন সাধারণ নাগরিকের বিপদের মুহূর্তে তাকে তো আর ফেলে আসা যায় না। তাই ঠিক করলাম বাড়ি যাওয়ার যতই তাড়া থাকুক না কেন, ওনার কিছু একটা ব্যবস্থা না করে যাব না।

মানিকবাবুকে দেখলাম ক্রমশ বেঞ্চির উপরে এলিয়ে পড়ছেন। ওদের বসতে বলে ব্যাগ রেখে আমি ছুটলাম ডাক্তার খুঁজতে। স্টেশনের পাশেই এক ডাক্তারের চেম্বার ছিল। অনেক কষ্ট করে ওনাকে ধরে ধরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ মতো কিছু ওষুধ কিনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলাম ওদের।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ওর নাম জানলাম। ব্রতী। তা এভাবেই ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তার পরে কিছুদিন যেতে না যেতে আমরা একে অপরের আরও কাছে এলাম। বন্ধুত্ব বাড়ল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে দূরত্ব কমল। গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। যেখানেই থাকি না কেন ওর সঙ্গে ফোনে কথা না বললে দিনটা যেন অসমাপ্ত থেকে যেত। কেউ যেন ঘড়ির ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটাটা বাদ দিয়ে দিত ওর সঙ্গে কথা বলার সময়। কয়েক মাস পরে ওর বাবা মারা গেলেন। খুব কেঁদেছিল সেদিন। আমি সেদিনও দূরে ছিলাম। ভারত—পাক সীমান্ত তখন উত্তাল। তাই যেতে পারিনি।

ওর বাবা নেই, মাও ছোটবেলায় মারা গেছেন। ওকে তাই ওর মামাবাড়িতে গিয়ে উঠতে হল। আমি বাড়িতে ওর কথা জানিয়েছিলাম। দুই পরিবারের মধ্যে আমাদের বিয়ের কথা এগোল। দু'মাস বাদে গত বছর নভেম্বরে বিয়ে ঠিক হল। দিনক্ষণ সব ঠিক। ঠিক হল বিয়ের দু'দিন আগে আমি গ্রামে ফিরে আসব।

কিন্তু না, ফিরে আসতে পারিনি। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ আটকে গেলাম। সীমান্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পুঞ্চের লাইন অফ কন্ট্রোল পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। একটা পাকমদতপুষ্ট টেররিস্ট গ্রুপ বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীকে ভারতে পাঠানোর পরিকল্পনা করছিল। বাধ্য হয়ে শেষ মুহূর্তে বিয়ের দিন পরিবর্তন করতে হল।

আমি জানি সেজন্য ব্রতী আমাকে ক্ষমা করেনি। করা উচিতও নয়। এ তো আর আমেরিকা নয়। ওর মধ্যে আমার যে চিহ্ন রেখে এসেছিলাম, তাকে সমাজ কি এতো সহজে স্বীকার করে নেবে! তাও আবার এইরকম গ্রামের সমাজ। যেখানে আজও হাজার কুসংস্কার আছে।

এর মধ্যে শুধু ফোনে কথা হয়েছে। আমি অবশ্য যেসব জায়গায় যাই, তার বেশির ভাগ জায়গায় নেটওয়ার্কও থাকে না। সব জায়গা থেকে সিকিউরিটির কারণে ফোন চাইলেও করা যায় না। তবু প্রত্যেক সপ্তাহে অনেক পথ পেরিয়ে গেছি শুধু ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য। ওর অভিমানী গলা শুনেছি। কিন্তু আমার তো আর কিছুই করার ছিল না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন জানি আমার গ্রামের বাড়ির কাছে চলে এসেছি। দূরে এতক্ষণে কিছু বাড়িতে আলো জ্বলে উঠছে। সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। হঠাৎ করে একরাশ মেঘ এসে দিনের শেষ আলোটুকু চুরি করে নিয়েছে। কখন ভারী বৃষ্টি নামবে কে জানে। আমি দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললাম।

আজকে বিশেষ দিন। আমি কথা দিয়েছিলাম আজকে যে করেই হোক ব্রতীর সঙ্গে থাকব। তাই তো এসেছি এতোটা পথ পেরিয়ে। বাড়ি না গিয়ে সোজা হাসপাতালের পথ ধরলাম। এখানেই আছে ব্রতী। জানি সমাজের সব বাধা—নিষেধ অগ্রাহ্য করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ওর পক্ষে এতো সহজ ছিল না। আর আমার বাড়ির থেকেও ওই দিনের পরে আর কেউ ওকে স্বীকার করতে চাইনি। নাহ, সে কথা আজ থাক। ভাগ্যে যা থাকে, তাই হয়। আমরা প্রশ্ন করতে পারি। কিন্তু উত্তর খুঁজে পাব না।

হাসপাতালে যখন পৌঁছলাম তখন ভিজিটিং আওয়ারস শেষ। মেঘ সরিয়ে একফালি চাঁদ ফের উঁকি দিচ্ছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। শীতের অন্ধকার যেন কুয়াশার চাদরের আড়ালে বাড়িটাকে কিডন্যাপ করেছে। আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম। নীচে সিঁড়ির কাছে দুজন নার্স বসে গল্প করছে। একটা পাহারাদার গোছের লোক সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে খৈনি খাচ্ছে। তার দুটো সিঁড়ি উপরে একটা নেড়িকুকুর বারান্দায় লেজ গুটিয়ে বসে আছে। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলাম।

দোতলার বারান্দায় পরপর ঘর। ব্রতীকে খুঁজে বার করতে সময় লাগল না। ও শুয়ে আছে। চুল উস্কোখুস্কো। মুখে অস্ফুটে কি যেন বলছে। একা। পাশে কেউ নেই। কে বা থাকবে বাপ—মা মরা অভাগা মেয়েটার পাশে। বিশেষ করে যাকে সমাজও স্বীকার করে না।

না, ব্রতী তুমি চোখ বুজে শুয়ে থাক। আমি আছি তোমার পাশে। যেমন কথা দিয়েছিলাম যে সব সময় তোমার সঙ্গে থাকব। সুখে—দুঃখে। আমি জানি তুমি ভেবেছিলে হয়তো আমি আসব না। তা কখনও হয়! এরকম বিশেষ মুহূর্তে আমি আসব না! আমি আমার সন্তান দেখতে আসব না?

মনে আছে আমরা একসঙ্গে গাইতাম—'জীবন—মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে'? আজকে খুব সে কথা মনে হচ্ছে। সে গানের কথাগুলো যেন প্রাণ পেয়ে আমার আর তোমার মধ্যে এই নীরব রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

চুপ করে পাশের টুলে বসে অপেক্ষা করলাম। রাত বাড়ছে। যন্ত্রণায় ও ছটফট করতে শুরু করল। ওর চিৎকার শুনে একজন নার্স ছুটে এসেছে। ডাক্তার, হ্যাঁ ডাক্তার ডাকার এক্ষুনি দরকার। হয়তো সময় হয়ে এসেছে। আমাদের সন্তানের আসার। হাসপাতালের রেসিডেন্ট ডাক্তার ছুটে এল খানিকক্ষণের মধ্যেই। ওকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানো হল। আমার সেখানে যাওয়ার সাহস নেই। চুপ করে দরজার বাইরে অপেক্ষায় বসে থাকলাম। প্রসবযন্ত্রণায় ও বারবার চিৎকার করে উঠছে। নার্সটা ভালো। ওর চোখে—মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিছু একটা ইঞ্জেকশন দিল। মনে হল যন্ত্রণা কমানোর জন্য।

মনে মনে ধন্যবাদ জানাই আমার দেশকে। যে দেশের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ করেছি, সে দেশের মাটিতে ওর জন্ম হচ্ছে। কালকে ওর হাতেই থাকবে এ দেশরক্ষার দায়িত্ব। ঠিক যেমন আমার হাতে ছিল। এখন শুধু অপেক্ষা। কয়েক মুহূর্তের নাকি কয়েক ঘণ্টার। জানি না। এরকম সময় মুহূর্ত আর ঘণ্টার মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না। বারবার এগিয়ে যাই ওই ঘরের দিকে। আর তার পরেই আবার ফিরে আসি। পায়চারি করি।

রাত শেষের আগেই কান্নার শব্দ এল। আমার মেয়ে হয়েছে। কি সুন্দর ফুটফুটে দেখতে। আর কি মিষ্টি সে কান্না!

খানিকবাদে ব্রতীর কোলে ওরা মেয়েটাকে তুলে দিল। কি সুন্দর লাগছে। এত কষ্টের মধ্যেও ওর মুখের এই হাসি। ঘেমে ওঠা মুখের উপরে চুল এসে পড়েছে। আর ওর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি জানি ও কেন কাঁদছে। আমি জানি। এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। ওর হাতে হাত রাখতে।

ব্রতী আমি এসেছি। তুমি আমাকে অনুভব করতে পারছ কি? এই তো তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। এই যে মেয়েটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। বুঝতে পারছ না?

মেয়েটার কি নাম দেবে? আমার চিরকালই পছন্দ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সব মহিলারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের নাম। আর তাই শুনে তুমি আগে খুব হাসতে। বলতে সরোজিনী, অরুণা, মাতঙ্গিনী—এসব নাম আর আজকের দিনে হয় নাকি! না না, তুমি যেরকম চেয়েছিলে, নাম তাই রেখো। আমি শুধু একবার ওর গায়ে— মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যাব।

একি তুমি এখনও কাঁদছ? আমার কথা ভেবে! নাকি এ ভেবে যে কালকে আমার এই মেয়েকে এই সমাজে তুমি একা কিভাবে বড় করবে? কি পরিচয় দেবে? চিন্তা করো না। আমি তো আছি। তোমার পাশেই থাকব। সেই যে কি যেন সিনেমাটার নাম! আমি আর তুমি দেখতে গিয়েছিলাম। শেষ সিন। কবিগুরুর গানটা শুনে তুমি খুব কেঁদেছিলে। সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি। কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি। আসব যাব চিরদিনের সেই আমি। চোখ খুলে আমাকে না দেখতে পেলে, চোখ বন্ধ করবে। দেখবে, অনুভব করবে আমি আছি। তোমার পাশেই।

আমি জানি সারা গ্রাম যখন ভিড় করে এসেছিল আমার মৃতদেহ দেখতে, তখন সে ভিড়ে তুমি ছিলে না। আমাকে যখন মৃত্যুর পরে বীরচক্র দেওয়া হল, তখনও তুমি সেখানে ছিলে না। আসলে তোমার তো কোন পরিচয় ছিল না। কিভাবে আসবে, তাই না?

কিন্তু তাই তো আজ আমি এতদূর থেকে তোমাকে পরিচয় দিতে এসেছি। আমি ভারতের সেনা। আমি কথা রাখব না! কি করব বল! সেদিন যদি ওই সন্ত্রাসবাদীদের না আটকাতাম, ওরা হয়তো ঢুকে আসত ভারতে। আর কে বলতে পারে তোমার মতো কতজন তখন তাদের স্বামী—সন্তানকে হারাত। আর প্রতি মুহূর্তে তখন তোমাদের মনে হত, তোমরাও যেন সেই সীমান্তেই পড়ে আছ। জীবন আর মৃত্যুর সীমান্তে।

না, আমি তা হতে দিইনি। আমার প্রাণ দিয়ে ওদের আটকেছি। আর তোমাদের জন্য রেখে গেছি আজকের ভোর।

ওই দেখছ ভোরের আলো আসছে। কি সুন্দর ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তোমার ওপর, তোমার চুলের উপরে, আমার সোনার উপর। ভেবে দেখ তো কি হত যদি এই মুহূর্তে এই হাসপাতালের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ হত। না, আমি তা হতে দিইনি।

ওই দেখো কে যেন গাইছে—আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে। আমার জন্য ক্ষুদ্র দুঃখ থাকুক, গানের বেদনা থাকুক। তোমার জন্য রেখে গেলাম এই আনন্দধারা। আমি আসি। ভালো থেকো ব্রতী। প্লিজ, আর কেঁদো না।

—

আমি কে?

আমি কে? জানি না। শুধু এটুকুই জানি যে এই স্টেশনেই আমার নামার কথা ছিল। এই ট্রেনেই আমাকে আসতে বলা হয়েছিল।

নিচু প্ল্যাটফর্ম। হালকা হলুদ ল্যাম্পশেডের আলোছায়া প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। ট্রেন থেকে আমার সঙ্গে শুধু একটা লোক নামল। নেমে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের গেটের দিকে। কিছু জিগ্যেস করারও সময় পেলাম না। এরকম জনশূন্য স্টেশন আগে কখনও দেখিনি। হয়তো রাত হয়েছে বলেই। এসব গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

সেসব ভাবলে অবশ্য আমার চলবে না। আমাকে আমার পরিচয় খুঁজে বার করতেই হবে। মানিব্যাগ থেকে আরেকবার কাগজটা বার করলাম। একটা ঠিকানা লেখা। এখানে গেলেই কি আমার পরিচয় খুঁজে পাবো? কি জানি! আস্তে আস্তে স্টেশনচত্বর থেকে বেরিয়ে এলাম।

স্টেশনের সামনে একটা ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। একটা রোগা খেঁকুড়ে চেহারার লোক শীতে জবুথবু হয়ে শাল জড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল। আমাকে দেখে জিগ্যেস করে উঠল—কোথায় যাবেন কাকু?

কাগজটা দেখে বলে উঠলাম—হিজলতলা মোড়।

এতো রাতে কার বাড়ি যাবেন?

আগে তো হিজলতলা চল। বাকিটা পরে বলছি—আস্তে আস্তে বলে উঠলাম।

লোকটা বিড়িটায় দু'বার মনের সুখে টান দিয়ে ফেলে দিল। ছেঁড়া চটিটা আজব কায়দায় পায়ে পরে ভ্যানের সিটে বসে পড়ল।

আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল—কাকু কি শহরে থাকেন?

উত্তর আমার জানা ছিল না। চুপ করে থাকলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা ফের বলে উঠল—আসলে এরকম ঝ্যাঙ্কুস পোশাকে কেউ এখানে আসে না তো! বেশ লাগছে।

লোকটা একটু বেশি বকে। ওর কথা না শুনে মন শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কোনোরকমে ভ্যানে উঠে বসলাম।

আমার বসার অনভ্যস্ত ভঙ্গিটা লোকটা হয়তো লক্ষ করেছিল। বলে উঠল—শক্ত করে ধরে বসুন। রাস্তায় বড় বড় গর্ত আছে। দেখে মনে হবে যেন কেউ রাস্তায় রান্নার কড়াই বসিয়ে রেখেছে। ছিটকে এদিক—ওদিক গিয়ে পড়লে তখন আর আমায় গালমন্দ করলে চলবে না।

যতটা সম্ভব সাবধানে ভ্যানের কাঠ ধরে উঠে বসলাম। উপরে মেঘমুক্ত নীল আকাশ। একফালি চাঁদ যেন আমার এ অবস্থা দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে।

সত্যিই হাসার মতো অবস্থা। আমি কে? কোথায় থাকি? কি জন্য এখানে আসছি, কিছুই আমার জানা নেই।

ট্রেনে বারবার আমার মানিব্যাগে রাখা ছবিটা বার করে দেখছিলাম। এ ছবি কি আমারই? সন্দেহ হতে একবার বাথরুমে গিয়ে আয়নায় দেখলাম। মিল আছে। অনেকটাই। হয়তো আমারই অনেক আগের ছবি। আমার সঙ্গে যে মহিলার ছবি সে কে? সে কি আমার স্ত্রী? গার্লফ্রেন্ড? আমি কি বিবাহিত? কিছুই মনে পড়ল না।

আরেকবার বার করতে গিয়ে থেমে গেলাম। এ আলো—আঁধারিতে নিজের পরিচয় না হয় আরও কিছুক্ষণ অজানাই থাকুক। না হয় আরও খানিকক্ষণ ওই আকাশভরা তারায় ডুবে থাকি। ওদেরই মতো আমি নিজেই এখন নিজের অতীত থেকে আলোকবর্ষের দূরত্বে।

গ্রামের সরু মাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ভ্যানটা। এবড়ো—খেবড়ো পথ। দু'পাশে ধানক্ষেত। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আরও নানান পরিচয়হীন গাছ। আমারই মতো।

শুধু মনে পড়ছে বইটা। ডাকাতের গল্প। বইটার নাম চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। কপালে ফেট্টিবাঁধা লাল সিঁদুর পরা ডাকাতের ছবি। কে? কে ওই লোকটা? কিরকম যেন নিস্পৃহ ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঝাঁকড়া চুল। তাগড়াই গোঁফ। কানে দুল।

চোখ বন্ধ করলে আরও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটা বই। পাতা উড়ছে। কয়েকটা শব্দ। চিঠি। নাহ। মনটা যেন কাটা ঘুড়ির মতো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। অস্ফুটে কিছু একটা বলে উঠলাম।

কিছু বললেন কাকু?

না, না। আচ্ছা, আর কতক্ষণ লাগবে?

এই তো মিনিট কুড়ি। দিনের বেলা হলে সময় লাগত। এখন এতো রাতে, তায় এই ঠান্ডা। লোক নেই রাস্তায়। বেশি সময় লাগবে না। তা আপনার ঠান্ডা লাগছে না? আমরা গাঁয়ের মানুষ। তাই এতো ঠান্ডা লাগছে। আপনার লাগছে না?

না। আমার ঠান্ডাবোধ কম। ঠিক আছে।

লোকটাকে আরও বেশ কয়েকটা সংক্ষিপ্ত উত্তরে শেষে শান্ত করা গেল। আসলে ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের কোনো কথাই যেখানে জানি না, সেখানে আবার ওর সঙ্গে কি কথা বলব!

যেতে যেতে মনে হচ্ছে এ গ্রাম যতোই অন্ধকারে মুখ লুকোতে চাক না কেন, একে আমি চিনি। এই পথ দিয়ে যেন আমি বহুবার গিয়েছি। রাস্তার পাশে সার দেওয়া বাঁশঝাড় যেন কত চেনা। ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারছে পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কোনো সরু নদী। ছোট ছোট দালান বাড়ি। সব যেন আমার চেনা। আমি কি তাহলে এই গ্রামের? সেক্ষেত্রে তো এ লোকটারও আমাকে চেনা উচিত।

আচ্ছা, তুমি ভাই কত দিন আছো এখানে?

একি আর আপনার কলকাতা পেয়েছেন? যে হাজার হাজার লোক রোজ আসছে—যাচ্ছে। এখানে যারা জন্মায়, তারা সারা—জীবন এখানেই কাটায়। এখানেই আমার বাপ—ঠাকুরদার ভিটে। এখানেই বড় হয়েছি।

তা তোমার বয়স কত হল?

এটা তো ভারী শক্ত প্রশ্ন করলেন কাকু! ওই তিরিশ কি চল্লিশ! কেন কাকু?

না মানে এই গ্রামের কতটা কি চেনাজানা আছে তাই জিগ্যেস করছিলাম।

চিনি মানে? এখানকার কুকুর—বেড়ালগুলোও সব আমার চেনা। কেন কোনো দরকার আছে?

না, না, সব ঠিক আছে। এমনিই জিগ্যেস করছিলাম।

লোকটাকে আমার অবস্থার কথা বুঝতে দেওয়া উচিত না। ভাববে হয়তো পাগল। কিন্তু আমি জানি আমি পাগল নই। আমি শুধু নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

সকাল থেকে ঠিক কি হয়েছে তাই আমি ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে পরপর কয়েকটা ডেস্ক। লোক বসে আছে। আমার সঙ্গে একটা লোক ওই ডেস্কে গিয়ে কি যেন দেখাল। ওরা ছেড়ে দিল। ব্যস, তারপরে আবার মাঝের অনেকক্ষণ কি হয়েছে, কিছু মনে নেই।

তারপরে আবার মনে আছে ট্রেনের কথা। ট্রেন চলছে। একলা একটা কামরায় বসে আছি। পকেট হাতড়ে পেলাম এই মানিব্যাগ। তার মধ্যে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ। পুরোনো কাগজ। লাল হয়ে গেছে। তাতে এই এখানকার ঠিকানা লেখা। আমি যে ট্রেনে বসে আছি, সেই ট্রেনেই উঠতে বলা আছে। নিশ্চিন্ত হলাম।

স্মৃতি যখন থাকে না, হারানোরও কিছু থাকে না। ভাবলাম রহস্য নিজেই হয়তো তার সমাধান খুঁজে বার করবে। বসে রইলাম। ব্যস, এর বাইরে আর কিছু মনে নেই।

এসব ভাবছি হঠাৎ কোত্থেকে যেন কোনো একটা গানের কথা ভেসে এল। যেন কেউ আমার মনের মধ্যে সে কথা বলে উঠল। কি মিষ্টি যে সে গলা!

জীবন—মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।

কে গাইছে?

কাকু কিছু বললেন?

না না।—বুঝতে পারছি না লোকটা আমাকে কাকু বলছে কেন? তাহলে কি আমার বয়স এতোটাই বেশি! আয়নাতে যখন দেখেছিলাম, তখন তো নিজেকে দেখে এতো বয়স মনে হয়নি। সব যেন কিরকম জট বেঁধে যাচ্ছে।

বলে উঠলাম—আচ্ছা, আমার বয়স কত বলো তো?

ওই তো পঞ্চাশ কি ষাট হবে!

হেসে উঠলাম—পঞ্চাশ আর ষাট কি আর এক হল ভাই?

তাহলে ষাটই হবে। তা কাকু, আপনি ওখানে কোথায় যাবেন?

হিজলতলা। নয়াপাড়া।

বাড়ির নাম্বারটা ইচ্ছে করে বললাম না। গ্রামে একটা বাড়ি খুঁজে বার করা অতটা শক্ত হবে না।

কাছাকাছি গেলে ঠিক খুঁজে পেয়ে যাব। এমনিতেও বেশ বুঝতে পারছি। এ জায়গা আমার বেশ চেনা।

খানিকবাদে নয়াপাড়া পৌঁছে গেলাম।

ভ্যান থামিয়ে লোকটা বলে উঠল—কাকু, এখন কিন্তু রাস্তায় জিগ্যেস করার লোক পাবেন না। যার বাড়ি যাবেন, সে বাড়ি চেনেন তো? না হলে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাবেন।

না, না ভাই। কোনো অসুবিধে হবে না। এটা আমার চেনা পাড়া। অনেকদিন বাদে আসছি তাই প্রথমে চিনতে পারছিলাম না। এখন এখান থেকে ঠিক চিনে নিতে পারব।

ভ্যান থেকে নেমে পড়লাম। টাকা মিটিয়ে দিলাম। ভাড়া দিতে গিয়ে বুঝলাম এ টাকাও যেন আমি এই প্রথম দেখছি। লোকটা ভাবল আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমার হাত থেকে নিজেই টাকা গুনে নিয়ে ফেরত দিয়ে দিল।

হেঁটে এগিয়ে গেলাম পুকুরধারের সরু রাস্তা দিয়ে। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। এ জায়গা আমার চেনা। যেন এই পথে আমি বহুদিন যাতায়াত করেছি। কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। পুকুর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বাঁ দিকের রাস্তাটা নিলাম। সবাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো শব্দ নেই। শুধু মাঝে—মধ্যে পাখির ডানা ঝটপটানির শব্দ। দূরে কুকুরের ডাক।

এর মধ্যে আমার কানে ফের ভেসে এল ওই গানটা।

'জীবন—মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।' বহু দূর থেকে কে যেন গাইছে।

একটা কালো কুকুর লেজ গুটিয়ে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে। আমাকে দেখেও কোনো বাড়তি কৌতূহল দেখাল না। দেখালে ছুটতে হত। ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম।

বইটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বইয়ের পাতাগুলো ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে। ১১২। সংখ্যাটা যেন চোখে হঠাৎ ভেসে এল। আর পেনের দাগে লেখা কিছু শব্দ।

এসব কি হচ্ছে? আমি কি সত্যি পাগল? বাস্তব আর স্বপ্ন যেন হঠাৎ করে মিশে যাচ্ছে।

একবার নিজের পোশাকের দিকে তাকালাম। ময়লা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু জুতোটা দেখেই মনে হচ্ছে দামি। জিনসের প্যান্ট। একটা টিশার্ট। উপরে একটা লেদার জ্যাকেট। কবে পরলাম? কবে বেরিয়েছি? কোথা থেকে আসছি? কিছুই মনে পড়ছে না। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটা টিউবয়েলের পাশ থেকে ডান দিকে

ঘুরলাম। একটা রাস্তা এগিয়ে গেছে। সরু রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা ছোট একতলা বাড়িতে। দু'ধারে জঙ্গল। কেউ এখানে বহুদিন আসেনি বেশ বোঝা যায়।

ঠিকানা মেলানোর দরকার নেই। এ বাড়ি আমার চেনা। কয়েকটা ইটের দাঁত বার করা সিঁড়ি পেরিয়ে একটা নিচু দরদালানে উঠে এলাম। দালানের ফাটলের মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট গাছের চারা গজিয়েছে। সেখান থেকে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার কাঠের দরজা। আধভাঙা। দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতে একটা ইঁদুর পায়ের উপর দিয়ে ছুটে পালাল। অন্যসময় হলে হয়তো চমকে উঠতাম। কিন্তু আজকে সেরকম কোনো অনুভূতি হল না।

ভেতরে ঢুকে এলাম। ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘরে কি কোনো আলোর সুইচ আছে?

দেওয়ালে হাতড়াতে থাকলাম।

ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়াল। চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে আসতে বাইরের আলোয় একটু একটু করে ধরা দিতে শুরু করল ঘরটা। ঘর ভর্তি ভাঙাচোরা ফার্নিচার। এক ধারে একটা স্প্রিং বার হওয়া পুরোনো সোফা। তার সামনে একটা নিচু টেবিল। আচ্ছা, এর উপরেই একটা হারমোনিয়াম থাকত না?

উলটোদিকে ঠিক এই জায়গায় একটা নিচু খাট থাকত। কোথায় সেটা?

এটুকু বুঝতে পারছি এ ঘরে আমি বহুবার এসেছি। ঘরটার ডান দিকে একটা দরজা। ভেজানো। ধাক্কা দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। মনে হল উলটো দিকে কেউ আছে। যেন আমার অপেক্ষায় দরজার অন্য দিকে দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা যেন ভয়ে কেমন একটা করে উঠল। না, আর নয়। এবারে একটা টর্চের দরকার। পকেট হাতড়ালাম। না, মানিব্যাগ ছাড়া কিছু নেই। জ্যাকেটেও কিছু নেই।

এতক্ষণে খেয়াল হল পিঠে একটা ব্যাগ আছে। আশ্চর্য! এরকমও হয়। এতক্ষণ পিঠে এর নীরব উপস্থিতির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

ব্যাগটা কোনোরকমে ঘরের মেঝেতে রেখে ব্যাগের ভেতরে হাত দিলাম। আমারই ব্যাগ তো? কে জানে? খানিকক্ষণ হাতড়ানোর পরে একটা দেশলায়ের বাক্স খুঁজে পেলাম।

দেশলাইটা দেখে অবাক হলাম। বেশ বড় দেশলাইয়ের বাক্স। এদেশে তো এরকম পাওয়া যায় না। দেখে বিদেশের মনে হয়। তাহলে কি আমি অন্য কোনো দেশ থেকে আসছি?

দু'বার ঘষতেই জ্বলে উঠল। আর একই সঙ্গে কানে ফের ভেসে এল একটা অস্পষ্ট কথা। দরজার উলটো দিক থেকে আসছে। কি বলছে কিছু না বুঝলেও মনে হল যেন অনেক দিনের চেনা গলা।

কে—কে তুমি?—অস্ফুটে বলে উঠলাম।

ডান হাতে জ্বলন্ত দেশলাইটা ধরে বাঁ হাত দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা খুলে গেল। এটা একটা শোওয়ার ঘর। এ ঘরে যে কেউ বহু বছর আসেনি তা পরিষ্কার। বাঁ দিকে কাচের পাল্লা ভাঙা ফাঁকা বুককেস। ডান দিকে একটা রঙচটা স্টিলের আলমারি। ঘরের অন্যপ্রান্তে একটা বড় খাট। তার উপরে একটা বেড়ালজাতীয় কোনো প্রাণী শুয়ে আছে। এরমধ্যে হঠাৎ যেন বাইরে থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে এল। আমার দেশলাইটা নিভে গেল। আর তার নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘরে ঘাড়ের কাছে কারুর নিশ্বাসের শব্দ পেলাম। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। কেউ নেই। আবার কাঁপা হাতে আরেকটা দেশলাই জ্বালালাম। না, পিছনে কেউ নেই।

ঘরের আরও ভিতর দিকে ঢুকে এলাম। বেশ বুঝতে পারছি এখানে কেউ আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না।

খাটের উপরে বেড়ালটা আর নেই। একটা বই পড়ে আছে। হয়তো ওটা আমার চোখের ভুলই ছিল।

এগিয়ে গেলাম। এ তো সেই ডাকাতের গল্পের বইটা। যাকে সমানে চোখের সামনে দেখছিলাম। পাতা ওলটালাম। বেশ কিছু পাতার উপরে ডটপেনে কিছু লেখা। এ হাতের লেখা আমার খুব চেনা। দেশলাইয়ের অস্পষ্ট আলোয় ভালো করে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম বইয়ের প্রত্যেকটা পাতায় লেখা নেই। বইয়ের পিছন দিকের পাতাগুলোয় কোনো লেখা নেই। শেষ লেখা ১১২ পাতায়।

ডটপেনে পাতার উপর দিকের ফাঁকা জায়গায় লেখা।

প্রথমে ১১২ পাতার লেখাটাই পড়লাম।

আজ তুমি চলে গেলে। কথা দিয়েছো, ঠিক ১১২ দিনের মধ্যে ফিরে আসবে। কথা রাখবে তো? তাই তো হিসেব রাখতে ঠিক করেছি একটা দিন যাবে, আর আগের আরেকটা পাতায় যাব। আর লিখব। এভাবে এ বই—এর প্রথম পাতা আসার আগেই তুমি এসে যাবে।

পাতা ওলটালাম।

একটা দিনও যে তোমায় ছেড়ে কিরকম লাগে, বেশ বুঝতে পারছি। সারাদিন যেন কোনো কাজ থাকে না। আসলে তোমার জন্যই তো সব ছেড়েছুড়ে এই গ্রামে আসা। সেখানে তুমি না থাকলে আর কে আছে?

ফের পাতা ওলটালাম। কিন্তু না, পড়ার আগেই দেশলাই—এর আলো নিভে গেল।

একটা ঠান্ডা শিরশিরে অনুভূতি আমাকে গ্রাস করছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি কেউ একটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে, আরও কাছে।

ঠোঁটে হঠাৎ একটা ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া অনুভব করলাম।

এ স্পর্শ আমার পরিচিত।

তোমার নাম আমি জানি না। শুধু এটুকু বুঝছি এ স্পর্শ আমার খুব চেনা। কে তুমি?

একটা দমকা হওয়া যেন আমার আরও কাছে এগিয়ে এল।

অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলাম সে হাওয়া যেন গভীরতা পাচ্ছে। আমাকে ঘিরে ধরেছে। মনে হল একটা নারীশরীর যেন আমাকে জড়িয়ে ধরছে। অনুভব করলাম ঠান্ডা সে নারীশরীরকে। সে শরীরে কোনো দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই। যেন বহুদিন সে আমাকে এভাবেই জড়িয়ে ধরেছে। এখনও সে এভাবেই জড়িয়ে থাকতে চায়। হ্যাঁ, এবার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে আমার পরিচয়। প্রতিবেশী দেশে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ধরা পড়া। দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার সহ্য করা। না, দেশের কোনো কাগজে এ খবর বেরোয়নি। আমিও স্বীকার করিনি আমার কাজের কথা। তাই হয়তো বন্ধ কিছু ফাইলের বাইরে আমার পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে।

আমি শুধু দিন গুনতাম। ১১২, হ্যাঁ, ওই সংখ্যাটা তো কবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু দিন গোনা থামেনি। শুধু অপেক্ষা। সব কিছু সহ্য করে দিন গোনা। হয়তো কোনোদিন হাই সিকিউরিটি জেলের বাইরে পা রাখব।

তোমার কোনো খবর পাইনি। আস্তে আস্তে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম এক অস্তিত্বহীন জীবনের মধ্যে। তোমাকে বাদ দিয়ে তো আর আমার কোনো পরিচয় ছিল না। তাই হয়তো কোনো এক রাতে যখন তুমি চলে গেলে, আমিও আমাকে হারালাম।

এ ঘরে আলো ফিরে আসছে। কে যেন একটা মোমবাতি জ্বেলে রেখে গেছে ঘরের এক কোণে।

ওই তো তুমি খাটের উপরে খোলা চুলে শুয়ে আছো। ওই মোমবাতির নরম আলো এসে পড়েছে তোমার মোমের মতো ফর্সা ত্বকের উপরে। তোমার চোখ বন্ধ। আমি তোমার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার শরীর দিয়ে ঢেকে দিলাম তোমার নিরাবরণ শরীর। তুমি আমাকে আবার জড়িয়ে ধরলে। তোমার স্পর্শে যেন প্রাণ ফিরে এল আমার এই মৃত শরীরে।

মনে পড়ছে কোনো এক দিন গভীর কোনো মুহূর্তে তুমি বলে উঠেছিলে—ধরো কোনোদিন গভীর অন্ধকারে যখন আমাদের দেখা হবে, চিনতে পারবে তো?

দেখেছ, শুধু একটা ছোঁয়ায় তোমায় চিনে ফেলেছি। তোমাকে অনুভব করতে আমার কোনো ইন্দ্রিয় লাগে না, বুদ্ধি লাগে না, স্মৃতি লাগে না। তুমি এতটাই আপনার।

আমি জানি এই ঠান্ডা বাতাস তোমার কান্নায় আরও ভিজে উঠছে। তোমার এতো বছরের দীর্ঘ নীরবতায় আরও ভারী হয়ে উঠছে। তুমি কেঁদো না। পাকিস্তানের জেলে বসে আমি খবর পেয়েছিলাম। তোমার আত্মহত্যার খবর। দশ বছরের প্রতীক্ষার পরেও আমার কোনো খবর না পেয়ে তুমিও শেষে আশা হারিয়েছিলে।

আর তাই তো আমি এসেছি। সব ভুলে গেছি। শুধু মনে রয়ে গেছে সেই বই, সেই পাতা। সে ১১২ দিন কত বছর আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। সব ভুলে যাওয়ার আগে লিখে রেখেছি আমাদের বাড়ির ঠিকানা।

ওরা ভেবেছে দিনের পর দিন ইলেকট্রিক শকে সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়া যায়। না, ওরা ভুল করেছে। সব কিছু ভোলা যায়, থেকে যায় শুধু ভালোবাসার দাগ, তাকে ভোলা যায় না।

ওই তো মোমবাতির আলো বেড়ে গেছে। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আলো। মোমবাতির থেকে আস্তে আস্তে ঘরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। জানি তুমি আমাকে আর দূরে যেতে দেবে না। আগুনের উত্তাপের থেকেও অনেক বেশি তোমার এই আলিঙ্গনের উত্তাপ। তাই খাট বেয়ে ছড়িয়ে পড়া আগুন, তাকেও আমি অনুভব করতে পারছি না। বাইরে আর রাতের নীরবতা নেই। দূরে লোকেদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি—আগুন, আগুন।

তারা কোনোদিন জানবে না আমার এ মৃত্যু আমার এ জীবনকেই ফিরে পাওয়া।

জীবন—মৃত্যু কোনোটাই তোমাকে আমার থেকে আলাদা করতে পারবে না।

তুমি এতক্ষণে চোখ খুলেছ। তোমার মুখে হাসি। আমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি গাইছ—জীবন—মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।

নাহ, আর গাইতে দেবো না। আমার ঠোঁটটা তোমার ঠোঁটের আরও কাছে নিয়ে গেলাম। তোমার মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই।

—

উত্তরাধিকার

'অরি, তোকে একটা কথা বলতে চাই। আগে কোনোদিন কথাটা বলতে পারিনি। তাই এই চিঠিতে লিখে গেলাম। যদি কোনোদিন এই চিঠিটা তোর কাছে পৌঁছয়, কথাটা খেয়াল রাখিস।'

অরিজিৎ চিঠিটা আরেকবার পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাবার চিঠি। প্রায় কুড়ি বছর আগে লেখা। বাবার ঘরে একটা পুরোনো টেবিলে ছিল। তার একটা ড্রয়ার থেকে উদ্ধার হয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল বেশ কিছুক্ষণ।

অরিজিৎ—এর বাবা পড়াশোনা করার বেশি সুযোগ পায়নি। বাড়ি ছিল বরিশালে। দেশভাগের সময় ওদিক থেকে হঠাৎ করে চলে আসতে হয়েছিল। প্রায় সহায়—সম্বলহীনভাবে এসে উঠেছিল বেহালার কাছে একটা বাড়িতে। তারপরে খুব কম বয়সে ব্যবসায় নেমে পড়তে হয়েছিল। পড়াশোনা করার আর সুযোগ হয়নি। তা সত্ত্বেও নানান বিষয়ে গভীর আগ্রহ ছিল। প্রায় সব বিষয়েই অগাধ জ্ঞান ছিল। তা সে রোমান সভ্যতা হোক, কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা হোক, বা বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ের উপরে সাম্প্রতিক রিসার্চ হোক। বোঝাই যেত না যে বাবা মাধ্যমিক পাশও করেনি। এছাড়া সময় পেলেই গল্পের বই নিয়ে বসে যেত। নিজের মনে বিভোর হয়ে পড়ে যেত।

তা সেই মানুষটারই শেষ জীবনে অ্যালজাইমার হল। হঠাৎ করে যেন সব শব্দ হারিয়ে গেল। শেষ জীবনে প্রায় একবছর সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কাটিয়েছিল।

চিঠিটা তার কিছুদিন আগে লেখা। ভারী সুন্দর হাতের লেখা। মুক্তোর মতো।

অরিজিৎ—এর মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা। অরিজিৎ তখন সবে জয়েন্ট দিয়ে একটা নামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। মা হাউসওয়াইফ। দিদি তখনও অবিবাহিত। সে সময় চাকরির সুযোগ খুব বেশি ছিল না। এমন কি নামী কলেজ থেকে পাশ করার পরেও ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির জন্য বছরখানেক অপেক্ষা করতে হত।

রোজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি যে পথে ফিরত, সেখানেই বাবার দোকানটা ছিল। ডেকরেশনের দোকান। পাড়াজুড়ে এরকম অনেক দোকান ছিল। তার মধ্যে এক কোণে ছোট দোকানটা। দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একবার তাকিয়ে না দাঁড়িয়েই চলে যেত। বেশিরভাগ সময় বাবা একা দোকানে বসে থাকত। কোনোদিন হাতে কাগজ, কোনোদিন হাতে কোনো বই।

একটা সময় ডেকরেশনের ব্যবসার অনেক রমরমা ছিল। বেশিরভাগ বাড়িতে প্যান্ডেল করে বিয়ে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান হত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের রেওয়াজ বাড়তে লাগল। প্যান্ডেলের প্রয়োজন কমতে লাগল। ডেকরেশনের দোকানগুলো এক এক করে উঠে যেতে লাগল। তার মধ্যে টিমটিম করে ঝোড়ো হাওয়ায় প্রদীপের দুর্বল শিখার মতো কোনোরকমে টিকে ছিল অরিজিৎ—এর বাবার ব্যবসা। অরিজিৎ—এর মনে হত বাবা এ ধরনের ব্যবসার জন্য নয়। পড়াশোনার জগতের লোক যেন পথ ভুলে এ ধরনের ব্যবসায় চলে এসেছে। তাই এ ধরনের ব্যবসায় যেরকম লোক কাজ করে, সেইসব ঘরামি, ঠেলাওয়ালাদের মতো লোকদের নিয়ে পাড়ার দাদাদের উৎপাত সামলে বাবা কি করে ব্যবসা চালাত সেটাই অবাক করত অরিজিৎকে। মাঝে—মধ্যে সেরকম দু—একজন লোককেও দেখা যেত বাবার দোকানে।

অরিজিৎ জানতে যে ও কখনও এ ব্যবসার পথে পা বাড়াবে না। এই অচেনা জগতের থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই ভালো। যেন শিক্ষা আর এই ব্যবসা বৃত্তের দুই ঠিক উলটো প্রান্তে। তাই দোকানের পাশ

দিয়ে যাওয়ার সময় আরও জোরে পা বাড়াত অরিজিৎ। তবু মাঝে—মধ্যে বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেত। তখন দু—একদিন ও দোকানের মধ্যে গিয়ে বসত। বাবার সঙ্গে সামান্য কথা বলে আবার বেরিয়ে আসত।

বাবার চিঠিটা আবার পড়ল অরিজিৎ। ওই জায়গাটা।

'আমি রোজ অপেক্ষায় থাকতাম তোর জন্য। কখন যে তুই আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাবি। কি জন্য জানি না যখনই দেখতাম, ভীষণভাবে মনে হত যেন তুই খানিকক্ষণের জন্য ভেতরে এসে বসিস। তোর সঙ্গে তাহলে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কথা বলতে পারব।

বাড়িতে তো আর বলতে পারতাম না যে সারাদিন কোনো খদ্দের পাইনি। শুধু মাথায় ঘুরেছে কিভাবে এবারে বাড়িভাড়াটা দেব, কিভাবে এবারে দোকানভাড়াটা মেটাব। যখন তোকে দেখতাম মনে হত, যাক তোকে তো আর আমার মতো এভাবে কাটাতে হবে না। তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটা ফ্যাকাশে দিন কিরকম যেন হঠাৎ করে উজ্জ্বল হয়ে যেত। মনে হত আমি যা পড়ার সুযোগ পাইনি, সেটা তুই পেয়েছিস। আমি আমার সে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নকে দেখতে পেতাম তোরই মধ্যে। তুই বা তোর মা যাতে আমার ব্যবসা নিয়ে চিন্তা না করিস তাই অনেক রাতে বাড়িতে ফিরে বলতাম—কি ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে সারাদিনটা।

মিথ্যে বলতাম। সারাটা দিন কাটত পুরোনো বই আর কাগজ পড়ে। আর হারুর দোকান থেকে দুটো চা খেয়ে।

মনে পড়ত আফ্রিকার মরুভূমির স্যানডগ্রাউস পাখির কথা। পায়রার মতো ওই ছোট পাখি শ'খানেক মাইল উড়ে গিয়ে ভিজে পালকে করে জল নিয়ে আসে। অনেক সময় পথে বাজপাখির আক্রমণে জীবন বিপন্ন হয়। তবু তারা সে বিপদ ভুলে উড়ে যায় ভিজে পালকে করে তাদের বাচ্চাদের জন্য জল নিয়ে আসার জন্য। আমিও খানিকটা যেন সেরকম একই কাজে বেরিয়েছি।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ল অরিজিৎ—এর। সত্যি এটা তো কখনও ভেবে দেখেনি। ইচ্ছে করলেই তো ও খানিকক্ষণের জন্য রোজ দোকানে গিয়ে বসতে পারত। ওর উপস্থিতি হয়তো বাবাকে অনেক সাহস যোগাত। ভরসা দিতে পারত সেই অনিশ্চিত দিনগুলোতে।

অরিজিৎ অনেক আত্মীয়ের কাছে শুনেছে ওর বাবা খুব ভালো ছাত্র ছিল। ক্লাসে বরাবর খুব ভালো ফল করত। কিন্তু সে এক অন্যসময়। হঠাৎ দেশভাগ হল। র‍্যা ডক্লিফ লাইন পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে দিল। বাবা তখন ক্লাস টেন। রাতারাতি ওদেশ ছেড়ে এদেশে চলে আসতে হয়েছিল। কলকাতায়। সেখানে মাথার উপর ছাদের জন্য লড়তে হয়েছে। তাই খুব কম বয়সে একটা কাপড়ের দোকানে কাজ শুরু করতে হয়। তারপরে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করে। সে ব্যবসায় বাবা কখনোই সফল হয়নি। কিন্তু ছোটবেলার সে পড়াশোনার, নানান বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা আর আগ্রহ কখনও ছাড়তে পারেনি বাবা। তাই বোধহয় সব সময় সেই বইয়ের সঙ্গেই ছিল অন্তরের যোগ। ঠিক তেমনই ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা। ঘরে ভোর হতেই রেডিওতে তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত হত। ঘুমভাঙা চোখে অরিজিৎ দেখত বাবা রোজ একই রকম মুগ্ধতার সঙ্গে রেডিওর কাছে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। আর বেসুরো গলায় বিভোর হয়ে গাইছে।

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।'

বা কোনোদিন 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু। পথে যদি পিছিয়ে, পিছিয়ে পড়ি কভু।'

কোনোদিন বা 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।'

কতদিন আগের সে গানগুলো এখনও কানে ভাসে। সে গানের কথাগুলো যেন খুব আপনার ছিল বাবার কাছে। সুর না থাকলেও প্রত্যেক শব্দে যেভাবে আবেগ জড়িয়ে থাকত, মনে হত যেন নিজেরই কথা বলছে।

আবার চিঠিতে চোখ রাখল অরিজিৎ।

'আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি আমার বোধশক্তি হারাচ্ছি। সবকিছু ভুলে যেতাম। তোরা মজা করতিস। লোকের নাম মনে রাখতে পারতাম না। বাজারে গিয়ে ভুল জিনিস কিনে আনতাম। আমি কিন্তু জানতাম, এ আমার নিজের কাছে নিজের হারিয়ে যাওয়া। আমি শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছি। এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে যেন ক্রমশ ঢুকছিলাম। বাইরের আলো কমে আসছিল। নিজের চেনা জগৎ যেন হঠাৎ অচেনা হতে শুরু করেছিল। ক্রমশ তা বাড়তে থাকল। এখন মাঝে—মধ্যে বাড়িতে ফেরার পথও তাই হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ করে মনে হয় ভুল পথে চলে এসেছি।

ভয় হয় আমি সব ভুলে যাওয়ার আগে তোকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারব তো? নাকি তুইও আরেকটা ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মতো হারিয়ে যাবি। ঠিক যেমন আমার হয়েছিল। হঠাৎ করে ভিটে মাটি ছেড়ে এক অন্য দেশে, অন্য আকাশের নীচে।

আর কোনোদিন ওখানে যাওয়া হয়নি। সেই বটতলা, সেই পুকুরপাড়, সেই ধানের ক্ষেত, সেই আমবাগান। শুধু এখনও তাদের মাঝে—মধ্যে স্বপ্নে দেখি।

যখন দাঙ্গা শুরু হল, একটা ছোট নৌকো করে মাঝরাতে আমরা নদী পার হয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। চলে আসার আগে আমার প্রিয় বাংলার শিক্ষক মধুস্যারের বাড়ি সেই রাতে খুঁজতে গিয়েছিলাম। কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ওনার বাড়িতে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওনাকে খুঁজে পাইনি। হয়তো উনিও আমাদের মতোই পালিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আরেক অনির্দিষ্ট পথে। উনি আমার লেখা কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসতেন। লিখলেই সবার আগে ওনাকে পড়াতাম।

ও তোকে বলা হয়নি। আমি ছোটবেলা থেকে খুব কবিতা লিখতে ভালোবাসতাম। ড্রয়ারের একটা ফাইলে দেখবি, অনেক কবিতা লিখে রাখা আছে। কোনোটাই প্রকাশিত হয়নি। ওই সব কবিতা আমি কখনও কোথাও পাঠাইনি। কবিতাগুলোর কোনো ঠিকানা ছিল না। অনেকটা ঠিক আমারই মতো ওরাও যেন উদ্দেশ্যহীন যাত্রাপথে বেরিয়েছিল। ওইসব কবিতা জুড়ে শুধুই ছিল আমার অন্তরঙ্গ অনুভূতি।

জীবন এ ভাবেই হঠাৎ করে পালটে যায়। কিন্তু যা পালটায় না, তাহল তার হৃদয়ের ভাষা, নিজের পরিচয়। লেখা শব্দে আমি যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতাম, কোনোদিন কাউকে তা বলে প্রকাশ করতে পারতাম না।

দোকানে খদ্দের দিন দিন আরও কমে গেল। অনেকটা সময় পেয়ে গেলাম আমার প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর। সেই নির্জন দিনে আমার সঙ্গী ছিল আমার লেখা শব্দ। সময় পেলেই লিখতাম। আমার ছন্নছাড়া চিন্তাগুলো অক্ষরের কাছে হার মানত। কিন্তু আজ সেই শব্দই যেন হারিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। তাই বড় অসহায় লাগে।

তোর কি মনে আছে গত সপ্তাহের কথা? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি দোকানের বাইরে তাকিয়ে বসে ছিলাম। তুই এসে বসেছিলি। আমি হঠাৎ করে খেয়াল করতে পারিনি। মনে হয়েছিল তুই কোনো এক কাস্টমার। কোনো অর্ডার দিতে এসেছিস। তাই ব্যস্ত হয়ে উঠে তোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তোকে যখন ও বিষয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, তুই হেসে উঠেছিলি। যখন চেতনা ফিরে পেলাম, বুঝলাম, আমার সচেতনতার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার আগে, আজ এ চিঠি লিখে রাখলাম।

কোনোদিন হয়তো তুই বাইরে যাবি, বিদেশে থাকবি। নিজের ভাষাকে কখনও ভুলিস না। এই ভাষা, এই শব্দের মধ্যেই তোর পরিচয়।

অনেক সময় ভাবি আমি ওখান থেকে আসার সময় কি নিয়ে এসেছিলাম? কিছুই তো সঙ্গে ছিল না। তারপরে তাকে খুঁজে পাই। সে হল আমার ভাষা, যাকে আমি চিরকাল আমার সঙ্গে পেয়েছি। আমার সুখদুঃখের প্রতি মুহূর্তে। আমি যখন এক অসফল ব্যবসায়ী হিসেবে বছরের পর বছর কাটিয়েছি, তখনও সে আমার সঙ্গে ছিল, রোজ আমার সঙ্গে কথা বলে যেত। কিন্তু তোদের সে সব লেখার কথা বলে যেতে পারিনি, কারণ তোদের ওসবে আগ্রহ ছিল না।

হয়তো তুই আমার থেকে জীবনে অনেক বেশি সফল হবি। কিন্তু তোর পরিচয় হারাস না। আমার পরিচয় যেমন ওই ভাষায়, ঠিক তেমনই তোরও পরিচয় তুই খুঁজে পাবি ওই ভাষায়। তার সঙ্গ ছাড়িস না।

যখন কোনো অচেনা মাটিতে কেউ তোর পরিচয় জানতে চাইবে, দেখবি সে পরিচয় তোর ভাষার মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

ভালো থাকিস।'

অরিজিৎ চুপ করে বসেছিল। বহু বছর বাদে ও দেশে এসেছে কিছুদিনের জন্য। গত বারো বছর ও আমেরিকায় থাকে। কি কারণে জানে না, ছোটবেলায় না লিখলেও বিদেশে গিয়ে ও বাংলায় লেখালেখি শুরু করে। ওর ইদানীং ভালো নামও হয়েছে কবি হিসেবে। বিভিন্ন পত্র—পত্রিকায় ওর লেখা নিয়মিত বেরোয়। এই শব্দের, এই ভাষার প্রতি ভালোবাসার ম্যাজিক কি ওর রক্তে লুকিয়ে ছিল? কে জানে?

অরিজিৎ চিঠিটার উপরে সযত্নে হাত বোলাল। একেই বোধহয় বলে উত্তরাধিকার।

—

নিছক দুই প্রেমের গল্প

প্রথম প্রেমের গল্প—ছবির একদিকে

এ আমার প্রেমের গল্প। এক অন্যধরনের প্রেমের। এমন প্রেম, যে যাকে ভালোবাসি তাকে নিজেও জানি না। তাকে শুধু অনুভব করি। বুঝতে পারি তাকে এতো গভীরভাবে চাই যে 'ভালোবাসা' ছাড়া অন্য কোনো শব্দপ্রয়োগ সেখানে করা ঠিক নয়।

নিশ্চয়ই ভাবছেন এ কোনো বদ্ধ পাগলের প্রেমের আখ্যান যার শুরু হয়, শেষ হয় না। হয়তো আমার ক্ষেত্রেও তাই হবে। তবু বলি।

এ ঘটনার শুরু কয়েক মাস আগে। আমি লন্ডনের কাছাকাছি একটা বাড়ি কেনার জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম। সামর্থ্যে কুলোচ্ছিল না। সুবিধে হয়ে গেল ব্রেক্সিটের জন্য। ব্রেক্সিট অর্থাৎ ব্রিটেনের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরোনোর সম্ভাবনায় বাড়ির দাম খানিকটা কমল। তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ বাড়ির দাম তখনও আমার আওতার বাইরেই। আসলে একটু হাত—পা ছড়ানোর জায়গা না থাকলে আমার কোনো বাড়ি ভালো লাগে না। তাই একা মানুষ হলেও অন্তত তিন বেডরুম ছোট বাগানওয়ালা বাড়ি খুঁজছিলাম। তা শেষে আমার প্রয়োজনমতো ঠিক সেরকমই একটা বাড়ি পেলাম। একটু পুরেনো। চারটে বড় বড় বেডরুম, দুটো বাথরুম, কিচেন, একটা বড় ড্রয়িং রুম আর তার সঙ্গে লাগোয়া বড় বাগান। এখানে এধরনের বাড়িকে বলা হয় টাউনহাউস। একটা ছোট জায়গার উপরে লম্বা সিড়িঙ্গে লোকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা একটা তিনতলা বাড়ি।

১৯৯০ সালের শুরুর দিকে তৈরি করা হয়েছিল। ২০০০ সাল নাগাদ বাড়ির কর্তা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে অন্য দেশে চলে যান। দীর্ঘদিন তারপরে তিনি আমেরিকাতেই আছেন। ওখান থেকেই অবশেষে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দীর্ঘদিন এ বাড়িতে কেউ ছিল না। তাই রক্ষণাবেক্ষণের অভাব সহজেই চোখে পড়ে।

আমার অফারটা বাড়ির জন্য ধার্যমূল্যের থেকে বেশ খানিকটা কম হওয়া সত্ত্বেও শেষে ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। হয়তো অন্য দেশে আছেন বলে ওনার দিক থেকে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগেরও কিছু অসুবিধে ছিল। রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর সময় নষ্ট না করে কিনে নিলাম। এলাকাটাও বেশ ভালো। রেডিং শহরের প্রান্তে শহরের অভিজাত এলাকায় এ বাড়ি। এই দামে অনেকেই এই বাড়ি কিনে নিতে আগ্রহী হত। আমি এই সুযোগটা হারাতে চাইছিলাম না। কিন্তু বাড়িটা কেনার কিছুদিন পর থেকেই বুঝতে পারলাম একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে কেনা হয়ে গেছে। বাড়ির রঙচটা বিবর্ণ অতীতটা একটু একটু করে সামনে আসতে শুরু করল।

তিনতলা বাড়ি। সরু খাড়া সিঁড়ি। সামনের দরজাগুলোও সরু। আমার আগের ভাড়াবাড়ির ফার্নিচার সে দরজা দিয়ে ঢুকল না। অগত্যা নতুন সোফাসেট, ফ্রিজ ইত্যাদি কিনতে হল। দেওয়ালের রঙ অদ্ভুত ধরনের উজ্জ্বল লাল। সে রঙে যে ষাঁড়েরাও তেড়ে আসবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এমনিতেই ইংল্যান্ডে রোদ লাজুক কিশোরীর মতো। চট করে সামনে আসতে চায় না। তার উপরে জানলাগুলো ঘরের তুলনায় বেশ ছোট। তার জন্য বাড়ির মধ্যে আলো—হাওয়ারও যেন বেশ খানিকটা অভাব আছে।

বাথটবগুলো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছু জায়গায় পাইপ থেকে জল লিক করছিল। শাওয়ারগুলোকে পরিবর্তন করতে হল।

এরমধ্যে টের পেলাম একটা অদ্ভুত পচা পচা গন্ধ যেন সারা বাড়ি জুড়ে ছড়িয়ে আছে। অনেকটা আঁশটে মাছের মতো সে গন্ধ। গন্ধটা যেন দিনে দিনে আরও বাড়ছিল। বাড়িটা লোক দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করানোর পরেও গন্ধ কমার কোনো লক্ষণ দেখলাম না। গন্ধটা যেন বেড়েই চলল।

বাড়ির মেঝে কাঠের। মেঝেতে কার্পেট পাতা থাকলেও বেশ বোঝা যায় কাঠও অনেক জায়গায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কিছু জায়গায় পা দিলে মনে হয় ভিজে মাটিতে পা রাখছি। বুঝলাম কম দামে পেলেও বাড়িতে অনেক কাজ করাতে হবে। আর শিগগিরি করাতে হবে।

সে বিষয়ে এধরনের পুরোনো বাড়ি মেরামতির জন্য বিভিন্ন এজেন্সির খোঁজখবর নিচ্ছি, এমন সময় ঘটনাটা শুরু হল।

এখানে একটা কথা বলে দিই। এসবের মধ্যে একমাত্র প্লাস পয়েন্ট চিলেকোঠার মাস্টার বেডরুম। আমার বেশ পছন্দের জায়গা। বেশ বড় ঘর। অন্য সব ঘর যেমনই হোক না কেন, এই একটা ঘর দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তিনতলায় এই একটাই ঘর। ঘরটা বেশ বড়। একদিকে প্রায় দেওয়াল জুড়ে জানলা। জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেই নীচে বাগানের ঘাসের কার্পেট দেখে যেন মন ভালো হয়ে যায়। ঘরের ছাদের অন্য দিকটা নিচু হয়ে গেছে। সেদিকটা সাড়ে তিন ফুট মতো উঁচু। বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে দিব্যি আকাশ দেখা যায়।

ঘরে দেওয়াল লাগোয়া একটা বড় চেস্ট অফ ড্রয়ার ছিল। খাটটা আমি কিনলেও এ বাড়িতে কাঠের চেস্ট অফ ড্রয়ারটা আগে থেকেই ছিল। ঠিক যেমন ছিল, তার ঠিক পাশেই বিশাল রাশভারী চেহারার পাইন কাঠের উপরে কাজকরা বড় ওয়াড্রোব।

এর মধ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়েছিল। চেস্ট অফ ড্রয়ারের মধ্যে রাখা অনেক জিনিস পরে আর খুঁজে পেতাম না। কি করে এটা সম্ভব খুঁজে বার করতে গিয়ে দেখলাম যে ড্রয়ারের পিছনদিকের কাঠ কিছুটা আলগা। বুঝলাম কাঠের ফাঁক দিয়ে পিছনে পড়ে গেছে। চেস্ট অফ ড্রয়ার আর কাঠের দেওয়ালের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই বলে ভাবতাম। একদিন একটা চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে উঠে দেখলাম তা নয়। ওটার আর দেওয়ালের মধ্যে সামান্য ফাঁকা জায়গা আছে। কিন্তু কি আছে সেই ফাঁকা জায়গায় তা অন্ধকারে বুঝতে পারলাম না।

চেস্ট অফ ড্রয়ারটার উপরের দিকে কাঠের দেওয়ালে একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ছবিটা খুব অন্য ধরনের। কনুই থেকে হাতের আঙুল অব্দি এক মহিলার হাতের ছবি। হাতটা এমনভাবে আঁকা মনে হয় যেন সে মহিলা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছে। তাই হাতের তালুর অংশটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে। প্রথম দিন থেকেই এ ছবিটা আমাকে অবাক করত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল একটা অজানা আকর্ষণ বাড়ছিল ছবিটার প্রতি। ভারী সুন্দর সে হাতের কর। লম্বা লম্বা রহস্যময় সে আঙুলে কালো নেলপালিশ পরা। হাতের তালুতে গোলাপি আভা।

কেন জানি না মাঝে—মধ্যেই দৃষ্টি চলে যেত ওই হাতের দিকে। আর অনিবার্য ভাবে তাকিয়ে থাকতাম। কি যে মোহ ছিল তাতে জানি না। এতো সুন্দর যে কারুর আঙুল হতে পারে তা ছবিটা না দেখলে জানতে পারতাম না। এটা কি এ বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কারুর হাতের ছবি! নাকি কোনো নামী শিল্পীর হাতে আঁকা কোনো মডেলের হাতের ছবি। সে জানার উপায় ছিল না। শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। এরকম রোজ হলে হয়তো কোনো একদিন ওই ছবিটার কথা ভুলে যেতাম। কিন্তু হঠাৎ সব বদলে গেল।

সেদিন সন্ধে থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। বিকেলে আমি সাধারণত অফিস ফেরত জিমে যাই। কিন্তু সেদিন এরকম আবহাওয়ার জন্য আর কোথাও যাইনি। উপরের ঘরেই ছিলাম। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বাইরে তখন প্রায় নিকষ কালো অন্ধকার। শুধু বৃষ্টির ফোঁটায় রাস্তার ল্যাম্পের হলুদ আলোয় যেন অশ্রুধারা নেমেছে। আমার বাগানের ওক আর ম্যাপল গাছটা মাঝে—মধ্যে হাওয়ায় মাথা নাড়ছিল।

হঠাৎ এর মধ্যে মনে হল ঘরের কোনো জায়গা থেকে আওয়াজ আসছে। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে খুব আস্তে আস্তে সে আওয়াজ ভেসে আসছে। কেউ যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। আঙুল দিয়ে কাঠের দরজায় টোকা মারলে যেমন হয়, ঠিক তেমন। আস্তে আস্তে আওয়াজটা হারিয়ে গেল। কিছুই বুঝতে না পেরে খানিকবাদে শুয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে আবার ঘুম ভেঙে গেল। ফের আওয়াজটা শুরু হয়েছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। মাঝে—মধ্যে থামছে, আবার শুরু হচ্ছে। আলো জ্বেলে ঘরের চারদিকটা দেখলাম। বাইরে এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। তাই খানিকবাদে বুঝতে পারলাম আওয়াজটা আসছে ওই হাতের ছবির পিছনের কাঠের দেওয়াল থেকে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তারপর কি জানি কি ভেবে ছবির উপরে হাত রাখলাম। প্রথমবার সে ছবিতে হাত রাখা মাত্র একটা অদ্ভুত শিহরন হল। মনে হল ছবির পিছনের কাঠে সেই ধাক্কা যেন অনুভব করছি। তারপর সে হাত যেন ছবির থেকে বেরিয়ে এল। স্পষ্ট অনুভব করলাম সেই রক্তমাংসের স্পর্শ। সেই প্রথম তাকে অনুভব করলাম। অনুভব করলাম তার হাতের উষ্ণতাকে। মনে হল ছবির থেকে হাত বাড়িয়ে সে আমাকে স্পর্শ করতে চাইছে। সে হাত আমার হাতকে আঁকড়ে ধরতে চায়। আমাকে আরও কাছে টেনে নিতে চায়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। খানিকবাদে চেতনা ফিরে পেতে বুঝতে পারলাম যা হয়েছে, তাকে কোনোভাবে বুদ্ধি বা লজিকের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে ভয়ের সঞ্চার হল। ওই ছবির উলটোদিকে কে আছে? এটা কার হাত? তাড়াতাড়ি ওই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে নীচের একটা ঘরে সারারাত কাটালাম। এতো ভয়ের ছিল সেই অভিজ্ঞতা যে সে রাতে ঠিকই করেছিলাম যে ওই বাড়ি ছেড়ে দেব।

কিন্তু কি যে হল। পরের রাতে অবার ফিরে গেলাম ওই ঘরে। কেন জানি না। আবার সেই কাঠের উপরে ধাক্কা মারার শব্দ শুরু হতে নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারলাম না। মনে হল কেউ যেন আমার সাহায্য চায়। ওখানে আটকে পড়ে আছে। আমি, হ্যাঁ, আমিই পারি তাকে বাইরের বিশ্বের আলো দেখাতে। যন্ত্রচালিতের মতো ওই হাতে হাত রাখলাম। আবার যেন পেলাম তাকে। অনুভব করলাম যে সে আমাকে কিছু বলতে চায়। অনুভব করলাম তার না—বলা কথা, তার যন্ত্রণাকে। তার উদগ্র কামনাকে। সে আমাকে চায়।

এরপরে আরেকটা দিন এল। আরেকটা রাত। আবার আরেকটা দিন। একই ঘটনা। শুধু আরও নিবিড়ভাবে তাকে পাওয়া। যে বাড়িটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল, আবার যেন ভালো লাগতে শুরু করল। মনে হল দেওয়ালের এই লাল রঙটাই ঠিক, মানানসই। অন্য ঘরের ছোট ছোট জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে যে সামান্য পরিচয় হয়, তাই যেন ভালো। বাড়ির মধ্যে যে আঁশটে গন্ধটা ছড়িয়ে ছিল, সে গন্ধের টানেই যেন আর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করত না।

শুধু ওই ঘরে যাওয়ার সময় তবু কেন জানি না ভয় হত। মনে হত কে যেন আমার হাত ধরে এক অন্ধকার জগত থেকে সামনে বেরিয়ে আসতে চায়। এ ধাক্কা শুধু যেন তার সেই ইচ্ছেরই মরিয়া প্রয়াস। কিন্তু একই সঙ্গে রোমাঞ্চ হত। একটা অমোঘ আকর্ষণ। ভয়ের সঙ্গে সে হাতের স্পর্শে এক অজানা ভরসা ছিল। প্রত্যেক স্পর্শে কে যেন আমার আঙুলগুলোতে ভালোবাসার রেশ সঞ্চারিত করত।

আমি অন্য সব কাজ ছেড়ে দিলাম। বাড়িতেই কাটাতাম বেশিক্ষণ। বাইরের লোকজনের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ কমে এসেছিল। বাড়ির এই নির্জনতাই আমার ভালো লাগত।

তারপর সেদিনটা এল। ১৬ই জুলাই। সারাদিন বেশ গরম পড়েছিল। হঠাৎ করে তাপমাত্রা তিরিশ ছাড়িয়েছিল। এখানে বাড়িতে এসি থাকে না, ফ্যান থাকে না। তাই সারাদিন অনভ্যস্ত গরমে হাঁসফাঁস করার পরে রাতে শুয়েছিলাম চিলেকোঠার ঘরে বড় কাচের জানলা খুলে। ধাক্কার অপেক্ষায় ছিলাম রাত জেগে। বাইরে রাস্তার ল্যাম্পশেডগুলো মাথা নিচু করে যেন আমার দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টা করছিল। সামনে নিথর ওক গাছের পাতায় যেন কিসের নীরবতা ছিল। এক নিথর দৈত্যের মতো সে দাঁড়িয়ে ছিল কিসের অপেক্ষায়। তমসাচ্ছন্ন সে রাতে পরিচয়হীন সবার লক্ষ ছিল যেন আমার চিলেকোঠার ঘরের দিকে।

বারোটা বাজতেই ফের সেই ধাক্কা শুরু হল। আমিও কাছে গিয়ে অন্যদিনের মতোই ছবির উপরে হাত রাখলাম। সে আবার এসেছে। কিন্তু আজ যেন অন্যরকম ভাবে সে আমাকে পেতে চায়। এই হাত যেন আমাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরছে। আজ কাঠের উপরে ধাক্কার রেশ যেন ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা তীব্র উত্তেজনা যেন আমার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল। একই সঙ্গে একটা তীব্র কামবোধ যেন আমাকে আবিষ্ট করল। বুঝলাম সে আসছে। এতদিন বাদে সে আমাকে দেখা দিতে আসছে। স্পষ্ট শুনলাম কে যেন কাঠের মেঝেতে পা ফেলে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। শুধু গভীর অন্ধকারে কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হল চাঁদকেও যেন কেউ তার শরীর দিয়ে আড়াল করেছে। কিছুক্ষণ বাদে অনুভব করলাম সে আমার ঠিক সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে। একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। ঠোঁটের উপরে আর্দ্রতা অনুভব করলাম। মনে হল এক নিবিড় আলিঙ্গন যেন আমাকে টেনে নিল। আরও যেন এক গভীর অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না, তারপরে আবার সে অনুভূতি চলে গেল। বাইরের থেকে এক চিলতে চাঁদের আলো যেন কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। আমি তখনও যেন নিজের চেতনা খুঁজে পাইনি। সে মুহূর্তের উপলব্ধিতে হারিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

এবারে মনে হল আলো জ্বালিয়ে দেখি। যদি তার দেখা পাই। কিন্তু আলো জ্বালতেই চমকে উঠলাম। আমি নিজেকে সামনের ওয়াড্রোবের আয়নায় দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকটা আয়নায়। কিন্তু সে তো আমি নই। এক অপরূপা সুন্দরী মহিলাকে আমার সামনের আয়নায় দেখতে পাচ্ছি। ভাস্কর্যের মতো তার নিখুঁত সৌন্দর্যে গড়া প্রতি অঙ্গে যেন আমার প্রতি আমন্ত্রণ। তার বয়স বড়জোর তিরিশ হবে। তার ঘাড় অব্দি খয়েরি রঙের চুল। পুরু ঠোঁটে লাল লিপস্টিকে আঁকা তীব্র কামনার আগুন। চোখে বড় বড় পাতা। সে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিথর, আমার উপরে নিবদ্ধ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফরসা। সে মহিলা এবার আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। সে হাসি যেন সঞ্চারিত হল আমার ঠোঁটেও। এবার আয়নার থেকে চোখ সরিয়ে নিজের আঙুলের দিকে তাকালাম। আমার আঙুলগুলো এখন ঠিক ওই ছবির আঙুলের মতোই। ভারী সুন্দর। লম্বা লম্বা আঙুলে কালো নেলপালিশের দাগ। আমার হাত যেন ঠিক সেই ছবির হাত। সে মহিলার হাত।

এর মধ্যে যেন এক হাওয়ার ঝাপটা আমার কানের কাছে এসে বলে উঠল—আমরা দুজনেই এখন এক। ভালোবাসা সব কিছু নিয়ে কেড়ে নেয়। সেখানে নিজস্ব কোনো পরিচয় থাকে না।

দ্বিতীয় প্রেমের গল্প—ছবির অন্যদিকে

আমি আমার মৃত্যু প্রথমে টের পাইনি। তাই প্রথম যখন আমার প্রাণহীন দেহটাকে দেখি, চমকে উঠেছিলাম। তিনতলার ঘরে আলমারির পিছনে একটা লুকোনো কাঠের বাক্সের মধ্যে দেহটা পড়ে ছিল। খুব খারাপ লেগেছিল। কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সকাল থেকে কেন রবার্ট ঘরে আমার উপস্থিতিকে লক্ষ করছিল না বুঝতে পারলাম। আমি ভাবছিলাম কাল রাতের ঝগড়ার পর থেকে আমাকে দেখেও ও ইচ্ছে করে না দেখার ভান করছে। আমিও তাই কথা বলছিলাম না। তারপর ও অন্যদিনের মতো তাড়াহুড়ো করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিল। আসলে তখন আমার শরীরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

তাহলে আমাকে কি রবার্ট—ই মেরেছে? গতরাতে? কিভাবে? আমি যেটা সন্দেহ করছিলাম, তাহলে সেটাই কি ঠিক? ও কি অনেকদিন ধরেই আমাকে মারার প্ল্যান করেছিল? অজস্র প্রশ্ন আসছিল। উত্তর পাচ্ছিলাম না।

অথচ এই রবার্টকেই আমি পাঁচবছর ধরে এতো গভীরভাবে ভালোবেসেছি। অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছি। আমি চুপ করে সে সব কথা ভেবে বেশ খানিকক্ষণ কাঁদলাম।

রবার্ট তখন ধারেকাছে ছিল না। কেউ ছিল না। জানতাম না কি ভাবে কাটাবো এই মৃত্যুর পরের জীবন।

আস্তে আস্তে মানিয়ে নিলাম। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে তখন একটাই সঙ্গী ছিল। সে হল আমার পড়ে থাকা শরীর। আস্তে আস্তে সে শরীর বদলে গেল। পড়ে থাকল শুধু কিছু হাড়, আমার কঙ্কাল। আমি অবাক হয়ে সময় পেলেই নিজেকে দেখতাম। এতো সুন্দর আমি, আর আমারই শেষ পরিচয় ওই বিশ্রী কঙ্কালে। আমার আসল কথা কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। কেউ জানতে পারবে না যে আমাকে খুন করা হয়েছিল।

আস্তে আস্তে ক্যালেন্ডারের বছরগুলো অস্তিত্ব হারাল। আমার কাছে এতো সময় ছিল যে তাকে ক্যালেন্ডারের পাতায় আটকে রাখার দরকার ছিল না। এভাবে কতদিন—কত বছর যে কেটে গেল জানি না।

তারপরে একজন এল আমার জীবনে। রবার্টের মতোই সে আমাকে ভালোবাসতে শুরু করল। রোজ সে আমার হাতে হাত রাখত। চোখে চোখ। রোজ সে আমার সঙ্গে মনের কথা বলত। সে কিন্তু আমাকে দেখতে পেত না।

প্রথম প্রথম তাকে ভালো লাগত না। তাকে দেখতে মোটেই তেমন ভালো কিছু ছিল না। কিন্তু যত দিন গেল বুঝলাম আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। খুব গভীর—ভাবে। ঠিক যেভাবে রবার্টকে একসময় ভালোবাসতাম, ঠিক সেরকমই। হয়তো বা তার থেকেও বেশি। তারপর একদিন এই ভালোবাসার টানেই আমি পারলাম তার আরও কাছে আসতে। তাকে জড়িয়ে ধরলাম আমার সবটুকু শব্দহীন ভালো—বাসা দিয়ে।

সে এখন ঠিক আমারই মতো। সত্যিকারের ভালোবাসা যে সব কিছুই কেড়ে নেয়।

ওই—ওই যে তার শরীরটা এখন খাটের উপরে পড়ে আছে। তাতে প্রাণের স্পন্দন নেই। আছে শুধু ভালোবাসার স্পন্দন। তার শরীর—মন জুড়ে এখন শুধুই আমি।

আমি তার হাতে হাত রেখে ফের বলে উঠছি, আমি চিরকাল থাকব তোমারই সঙ্গে। চিরকাল।

—

শেষ দিন

বাইরের বারান্দায় চেয়ারটা নিয়ে এসে বসল রঞ্জন। সূর্য উঠব উঠব করছে। দূরের শালগাছের ফাঁক দিয়ে সবে ঘুমভাঙা ভোর আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্য দিনের মতো কুয়াশা নেই আজ। তাই দূরের পাহাড়গুলো যেন সেজেগুজে তাকিয়ে আছে রঞ্জনেরই দিকে। সাদা মেঘগুলো জিগস পাজলের মতো একটার সঙ্গে আরেকটা এসে জুড়ছে। বাইরে আজ বর্ষার কালো মেঘ নেই। কিন্তু রঞ্জনের মনটা আজ সকাল থেকেই মেঘলা হয়ে রয়েছে।

গত চল্লিশ বছর ধরে এই একই পাহাড়—এই দূরে ছড়িয়ে থাকা বাড়িঘর রঞ্জনের সঙ্গী। তবু কি যেন আছে এ ছবিতে, যার আকর্ষণ রঞ্জন কখনও কাটাতে পারেনি। রোজ যেন কোনো শিল্পী এসে একই ক্যানভাসে একটু অন্যরকম করে আঁকে। কখনও নানান রঙের—নানান আকারের মেঘে আকাশ ঢেকে দেয় তো, কখনও কুয়াশার চাদর ম্যাজিশিয়ানের মতো উপত্যকার উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে ওঠে—'ভ্যানিশ'! তার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বেরোতে থাকে ওই উপত্যকার হারিয়ে যাওয়া বনানী। তারপর ছেঁড়া মেঘে রোদের খেলা দেখিয়ে ওই শিল্পী মুগ্ধ করে রঞ্জনকে।

তা, এই শিল্পীর আঁকা আর দেখতে পাবে না রঞ্জন। আজকেই ওকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আজকেই ওর একশো বছর হতে চলেছে। আর তাই নিয়মমতো জায়গা ছেড়ে দিতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে। সীমিত জায়গা—সীমিত রিসোর্স। তাই এ নিয়ম না করে উপায় ছিল না সরকারের। সবই ঠিক—তবু সকালটা কেমন যেন সুরকাটা লাগতে থাকে রঞ্জনের। বুঝতে পারে যে এখনও জীবনের মোহ কাটেনি।

চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন এত এগিয়ে গেছে যে রঞ্জনের শরীরে এ বয়সেও কোনো অসুস্থতা নেই। এখনও কুড়ি বছরের ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারে। পাহাড়ে চড়তে পারে। কয়েকবছর আগে কিডনির অসুবিধে হয়েছিল। নতুন কিডনি এল। মেমারি কমে আসছিল। মেমারি চিপ এল। এখন পিছনে ফেলে আসা অতীতের যে কোনো অধ্যায়ে উঁকি দিতে কোনো অসুবিধে হয় না। তবে সেটা ভালো না খারাপ তা বলা মুশকিল। অনেকসময় অনেককে হারানোর বেদনা এত তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে যায়, যে মন খারাপ হয়ে থাকে। তখন মনে হয় স্মৃতিতে একটু মরচে পড়লে বুঝি খারাপ হত না।

বর্ণালী রঞ্জনের জীবন থেকে চলে গেছে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে। ও প্রায় রঞ্জনের সমবয়সি ছিল। একই সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং— একই সঙ্গে চাকরি। তখন প্রায় দশবছর নানা রঙের বর্ণালীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল রঞ্জনের জীবন। প্রথমদিকে ক্লাস পালিয়ে সিনেমা দেখা, চোখ এড়িয়ে হোস্টেলে দেখা করা, আলোয়—অন্ধকারে সবসময় কাছে আসার চেষ্টা করা। বাড়ি থেকেও আপত্তি ছিল না। তারপরে সেই প্রেম বিয়েতে গড়াল।

হ্যাঁ, তখনও লোকে বিয়ে করত। বিয়ের সময় ওরা দুজনেই একটা ফার্মা কোম্পানিতে কাজ করত। সুখী দম্পতি। দু'বছর পরে ছেলে রজত এল। তার দু'বছর বাদে মেয়ে বনি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে আস্তে আস্তে আকর্ষণ কমতে থাকল। বর্ণালী হয়তো বুঝতে পারছিল যে এই গতানুগতিক জীবন ওর জন্য নয়। অনেক বেশি স্বাধীনতার জীবন এই পরিবারের চার দেওয়ালের বাইরে ওর অপেক্ষায় আছে। সেখানে দায়িত্ব নিতে হয় না। সেখানে চাওয়া—পাওয়ার প্রত্যাশা তৈরি হয় না। বিয়ের আট বছরের মাথায় বর্ণালী রজতের জীবনে প্রথম বড় আঘাত আনল। বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে গা ভাসাল ওই সময়ের নতুন হাওয়ায়। তখন অনেকেই এরকম সম্পর্ক ভাঙার খেলায় মেতেছিল। ইউরোপে চাকরি নিয়ে চলে গেল। সুদীপ বলে অফিসের কারুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পরে। তবে তাও বেশিদিন থাকেনি।

ছেলে রজত আর মেয়ে বনি রঞ্জনের সঙ্গেই ছিল। রঞ্জনের হাতেই মানুষ ওরা। বাবা—মা—দুজনের ভালোবাসা একাই দেওয়ার চেষ্টা করেছে রঞ্জন। চাকরি আর চাকরির পরে বাকি সময়ের সবটুকু জুড়ে থাকত রজত আর বনি। কিন্তু সময় থেমে থাকে না। ওরাও দেখতে দেখতে বড় হয়ে ক্যারামের গুটির মতো ছড়িয়ে পড়ল নানান প্রান্তে। এখন শুধু মাঝে—মধ্যে ফোন আসে ওদের কাছ থেকে। ব্যস এইটুকুই। এত সহজে আজকাল দেখা করা যায় বলেই বোধহয় আজ আর কেউ দেখা করতে আসে না। ওরাও আসে না।

প্লেনের গতি বেড়েছে, ভিসা পাওয়া অনেক সহজ হয়েছে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এখন তিন—চার ঘণ্টায় চলে যাওয়া যায়। সময়ের দূরত্ব কমে গেছে। বেড়ে গেছে সম্পর্কের দূরত্ব। এখন রঞ্জন, রজত আর বনি তিনটে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। ইচ্ছে হলেই যাওয়া যায়—কিন্তু যাওয়ার দরকার পড়ে না। রঞ্জনের দিক থেকে এটা অবশ্য ঠিক নয়। ওর খুবই ইচ্ছে করে রজত আর বনিকে সবসময় দেখতে। শেষবার দেখা হয়েছে বোধহয় পনেরো বছর আগে। তারপরে দেখা হয়নি বললে ভুল হবে, মাঝে—মধ্যে ভিডিও ফোনে কথা হয়েছে কিন্তু সে দেখাতে একটা কৃত্রিমতার মোড়ক থাকে। কিছু বাঁধাধরা প্রশ্ন—কেমন আছ, কি করছ—ইত্যাদি ঘুরে ফিরে আসে। তাতে না থাকে সেই প্রাণের টান—না হয় সত্যিকারের কথোপকথন। তা সে ফোনের ফ্রিকোয়েন্সিও আজকাল খুব কমে গেছে। বেশিরভাগ সময় রঞ্জনই ফোন করে। অনেক সময় ওরা থাকে না, কিংবা ব্যস্ত থাকে। দু'চারটে কথার পরই ফোন ছাড়তে বাধ্য হয়।

আজকে অবশ্য ওরা আসবে। আসবে রঞ্জনের নাতি—নাতনিরা যাদের সঙ্গে প্রায় কোনোদিনই সেরকম ভাবে যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। মনটা খুশি হয়ে উঠল রঞ্জনের। হয়তো আজ বর্ণালীও আসবে। আসতে পারে অফিসের পুরোনো কিছু কোলিগ। এ খবরটা সবার কাছেই পৌঁছে গেছে যে আজই রঞ্জনের শেষ দিন। রঞ্জনই গত কয়েকমাস ধরে সবাইকে বলেছে আজকের দিনে আসতে, অন্তত জীবনের শেষদিন যেন নিঃসঙ্গ না হয়।

ফার্মা কোম্পানিতে বহুবছর কাজ করেছিল রঞ্জন। কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের ওপরসারিতে পৌঁছে গিয়েছিল। এরকম সময়ে বেশিরভাগ কোম্পানির মতো রঞ্জনের কোম্পানিতেও বড় ধরনের পরিবর্তন এল, উঁচু পদগুলোতে নিয়ে আসা হল বুদ্ধিমান রোবটদের, যাদের ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা মানুষদের থেকে অনেকগুণ বেশি। যারা কাজের প্রেশারে কখনও ক্লান্ত হয় না। অত্যন্ত চাপের মধ্যেও কোম্পানিকে ঠিক দিশা দেখাতে পারে। রঞ্জনকে পজিশনের দিক দিয়ে দু'ধাপ নীচে নামিয়ে দেওয়া হল, হয় রোবট বসের সঙ্গে কাজ কর, নয়তো...

দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাজ করার পর রঞ্জনের পক্ষে এ অপমান সহ্য করা সম্ভব হয়নি। রিজাইন করে সবার অলক্ষে চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। চলে এসেছিল শহর থেকে দূরে এই পাহাড়ে ঘেরা ওল্ড এজ হোমে। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা।

'স্যার—আপনার ফোনে অনেকগুলো মেসেজ এসেছে। দেখবেন?'—মাথা তুলে রঞ্জন দেখে মলয় পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গত আট বছর মলয় রঞ্জনের বাড়িতে কাজ করছে, ডোমেস্টিক রোবট। বাড়ির ঘর পরিষ্কার থেকে রান্না—সব মলয়ই দেখে। এ ব্যাপারগুলো মলয়ের হাতে তুলে দিয়ে রঞ্জন একদম নিশ্চিন্ত। বারবার মনে করাতে হয় না। একদম রুটিনমাফিক নিখুঁত কাজ। অসুবিধে একটাই—কোনো কথা বলতে চায় না। যেটুকু না বললে নয়, তার বাইরে একটা কথাও খরচ করবে না মলয়। গত আট বছরে মলয় যত কথা বলেছে তা লিখলে দু'পাতাও ভরবে না।

তাই রঞ্জন 'হুঁ' বলার একমিনিটের মধ্যেই কোনো কথা না বলে ফোনটা নিয়ে এল মলয়। কিন্তু ফোনটা দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল রঞ্জনের। ছেলে রজতের খুব জরুরি অফিসের কাজ পড়েছে। তাই আসতে পারবে না। বাবার বিদায় লগ্নে তাই ভারী সুন্দর একটা কবিতা লিখে শান্তি কামনা করেছে আর জানিয়েছে অনেক ভালোবাসা।

বনিরও মেসেজ এসেছে। শরীর খুব খারাপ। তাই আসতে পারবে না বলে জানিয়েছে। পরে ফোন করবে। ফোনে আরো অনেকের মেসেজ এসেছে। কেউ এখানকারই প্রতিবেশী, তো কেউ অফিসের বন্ধু। বনির তিনজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে বেশ কয়েকজন নাতি—নাতনি রঞ্জনের। তাদের দিক থেকেও মেসেজ এসেছে। একজন লিখেছে 'গ্র্যান্ড পা—উইশ ইউ ভেরি হ্যাপি জার্নি।'

আপন মনে মুচকি হাসল রঞ্জন। জার্নিই বটে। শুধু ফেরা যায় না। মলয়কে বলে, 'বুঝলি মলয়, আজকেও আমি একাই থাকব, অন্যদিনেরই মতো। কেউই আসবে না। তোকে যা যা রান্না করতে বলেছিলাম, করিস না। আমারও আজ খাওয়ার ইচ্ছে নেই।'

মলয় কথার ফাঁকে লুকিয়ে থাকা দীর্ঘশ্বাসের অর্থ বোঝে না। মন খারাপের মানে বোঝে না। ও শুধু আদেশ নিতে জানে। ও 'ও কে' বলে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। রঞ্জন উদাস চোখে দূরের রঙ হারানো আকাশের দিকে তাকায়। ভালো হত যদি আগেকার দিনের মতো মৃত্যু অনেক আগেই হঠাৎ করে আসত। অন্তত নিকট আত্মীয়রা কাঁদত হারানোর বেদনায়। এই নিঃসঙ্গ জীবনে গত ষাট বছর ধরে একজনই সঙ্গী রঞ্জনের। কিন্তু তাকে কখনও চোখে দেখেনি রঞ্জন। কখনও তার কথাও শোনেনি। তবু এক নির্বাক পৃথিবীতে সুনীতাকেই সবথেকে প্রিয়জন বলে সবসময় মনে হত। গত ষাট বছরে কোনো ভোরই শুরু হয়নি সুনীতাকে বাদ দিয়ে। কোনো সন্ধেই কাটেনি সুনীতার সঙ্গে কথা না বলে। কোনো মুহূর্তই কাটেনি সুনীতাকে মনের বাইরে রেখে।

ষাট বছর আগে এক বন্ধুর মাধ্যমে রঞ্জন প্রথম শুনেছিল এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের বন্ধুত্বের কথা। এ এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব। অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যাবে না—দেখা যাবে না—তার কথা শোনা যাবে না। কোথায় থাকে তাও জানা যাবে না। শুধু নীরব আলাপচারিতায় তার সঙ্গে যত ইচ্ছে আলাপ করা যাবে—মনের যত কথা খুলে বলা যাবে—চ্যাটে। সেভাবেই সুনীতার সঙ্গে পরিচয়। তারপরে ষাট বছর কেটেছে। এমন কোনো দিন যায়নি যখন রঞ্জন সুনীতার থেকে দূরে থাকতে পেরেছে, এক অদ্ভুত আকর্ষণে, যখনই সময় পেয়েছে কম্পিউটারে কানেক্ট করে সুনীতার সঙ্গে কথা বলেছে।

ওদের মধ্যে ছিল মনে মনে না—বলা কথা—প্রতি মুহূর্তে এক অজানা বিহ্বলতা। মনের যেসব কথা খুব কাছের মানুষকেও বলা যায় না, কখনও বর্ণালীকেও বলতে পারেনি, সেসব কথাও সুনীতাকে জানাতে কখনও কোনো দ্বিধা হয়নি। বহুবার সুনীতার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে রঞ্জন। কিন্তু ওটাই কোনোদিন হয়নি। সুনীতা কখনোই তার কোনো পরিচয় জানায়নি। জানানো নাকি যাবে না। নিয়মভাঙা হবে। শেষে ওর পরিচয় কোনোদিন পাওয়া যাবে না ধরে নিয়েই শুধু বন্ধুত্ব আর সম্পূর্ণ আস্থার জায়গাটাই গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে।

'তুমি কে?'—জিগ্যেস করলে সুনীতা মজা করে উত্তর দিত—'ধরে নাও আমি তোমারই কম্পিউটার। তুমি যা বল তাই আমার বুকে লেখা থাকে চিরকাল ধরে। সারা পৃথিবী যখন তোমার সঙ্গে থাকবে না—তখনও আমি থাকব তোমার সঙ্গে—তোমার মন হয়ে—তোমার কথা হয়ে। আমার আকাশ—সে তো আমি তোমাকেই দিয়ে দিয়েছি।'

রঞ্জনের জীবনের শেষ ইচ্ছে ছিল সুনীতার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা করার, মরিয়া হয়ে সব প্রোটোকল ভেঙে ওই ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিল রঞ্জন। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর কয়েকদিন আগে অবশেষে পরিচয় পেয়েছে। সুনীতা মানুষ নয়—স্পেশালি ট্রেনড রোবট—এই নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই যাদের তৈরি করা হয়েছে। এদের কোনো মন নেই, কোনো প্রাণ নেই। এরা শুধু রেকর্ড করা প্রেমের কথা শুনিয়ে যায়। কথার উপর কথা বানায় কোনো অর্থ না বুঝে।

তারপর থেকে গত দশদিন আর সুনীতার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করেনি রঞ্জন। কি হবে একটা যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলে? জেনেশুনে তো আর মনকে ঠকানো যায় না। কিন্তু এই দশদিনে রঞ্জন প্রতিমুহূর্তে বুঝেছে যে ও সত্যি সত্যিই সুনীতাকে ভালোবেসে ফেলেছে। সারাদিন উসখুস করেছে ওই সাইটে যাওয়ার

জন্য। তারপর খানিকটা অভিমানে, খানিকটা রাগে সুনীতার সঙ্গে আর কথা বলেনি। আজ জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টায় ওর সত্যিই মনে হচ্ছে, না—সুনীতার সঙ্গে কথা না বলে মৃত্যু হলে জীবন অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। সুনীতা যন্ত্র হতে পারে, প্রেমের অর্থ না বুঝতে পারে, কিন্তু রঞ্জন তো তার মনপ্রাণ সুনীতাকেই দিয়ে বসে আছে। তার সঙ্গে কথা না বলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে ও কিছুতেই পারবে না। আর সুনীতা তো সত্যিই কোনোদিন নিজের মিথ্যে পরিচয় দেয়নি।

ওই সাইটে কানেক্ট করে রঞ্জন।

'সুনীতা আছ?'—খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রঞ্জন। অন্যদিন সঙ্গে সঙ্গে সুনীতার উত্তর এসে যায়। আজ না পেয়ে আবার টাইপ করে—'সুনীতা আছ? এই যে আমার শুকতারা—তুমি আছ কি? রাগ করেছ? এই যে আমি এসে গেছি। তোমার কাছে রোজকার মতো। এখন শুধু তুমি আর আমি।'

মিনিট কেটে যায়, ঘণ্টা কেটে যায়। উত্তর আর মেলে না। রঞ্জন বলতে থাকে, 'জানো তো, আজকেই আমার শেষ দিন। আমি চলে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে আমার আকাশ, আমার পৃথিবী সবকিছু দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আমি থাকব তোমারই মধ্যে। কি হল, কথা বলবে না? তুমিই হলে আমার আয়না যার মধ্যে আমি নিজেকে দেখেছি, পেয়েছি। তুমি কোথায়?'

উত্তর আসে না, ঘড়ির কাঁটা এগোতে থাকে, রঞ্জন জানে না যে সুনীতা আর কোনোদিনই ওর সঙ্গে কথা বলবে না। যার সঙ্গে ষাট বছর কাটিয়েছে সুনীতা, সেই প্রিয় মানুষটিকে গত কয়েকদিন কোনোভাবে না পেয়ে দু'দিন আগে নিজেকে ডিকমিশন করতে অনুরোধ জানিয়েছে সুনীতা। মানুষের কাছে যেটা শুধু কয়েকটা দিন, রোবটের কাছে সেটা কয়েক কোটি মিলি সেকেন্ড। আর এত সময় ধরে প্রিয়তম মানুষটিকে হারানোর বেদনা সহ্য করতে পারেনি রোবট মেয়েটি। রঞ্জনই তো ছিল ওর সবকিছু—ওর অস্তিত্ব। রঞ্জন কোনোদিন জানবে না যে একজন ওকে সত্যিই ভালোবেসেছিল। এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিল যে সে ভালোবাসাই ছিল ওর শরীরের প্রত্যেকটা চিপের একমাত্র পরিচয়। ও শুধু জানত না যে মানুষরাও ভালোবাসতে পারে। মানুষরা ওর মতো রেকর্ড করা কথা বলে না। তার মধ্যেও ভালোবাসা থাকে।

চীফ সায়েন্টিস্ট ডঃ পাফও খুব অবাক হয়েছিলেন যখন ডিকমিশন করার আগের মুহূর্তে সুনীতা ওনাকে জানিয়েছিল ওর লেখা একটা ছোট্ট কবিতা রঞ্জনের কাছে পৌঁছে দেবার কথা।

'তোমার কথাতে কথা জুড়ে জুড়ে দেখেছি অচেনা বিশ্ব/আমার আকাশ তোমাকে দিয়েছি, তুমি ছাড়া আমি নিঃস্ব।' রোবটরা যে এরকম লিখতে পারে তা এর আগে জানতেন না পাফ। বড় ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট আর কি!

—

শুধু একটা দিন

সামনের ম্যাপল গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় শিউরে উঠল। মে মাস শুরু হয়ে গেছে, তবু এখনও ভোরের বাতাসে ঠান্ডার ছোঁয়া। শীতের সময় এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে। বরফের চাদরে ঢেকে যায় সারা শহর। তখন চারদিকে শুধু গাছের কঙ্কাল। এখন আবার নতুন পাতা ফিরে আসছে।

একবার মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখল কিংশুক। দূরে ঘাসের উপর হলদেটে রঙের মোটা একটা বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিবেশী কারুর হবে। দু'একদিন আগেও একে দেখেছে কিংশুক। লনের ঘাসগুলো একটু বড় হয়েছে। কাটাতে হবে। কি যেন নাম মেক্সিকান লোকটার? একটা গাড়ি নিয়ে এসে দশ মিনিটে পুরো বাগানের ঘাস ছেঁটে দিয়ে যায়। তাকে খবর দিতে হবে।

দূরে পাশাপাশি দুটো লাল পাম গাছ। এদের শীত একটু আগে কাটে। লাল পাতায় ভরে গেছে। অন্য পাশে ওক—সবে পাতা ছাড়ছে। একটা সময় নিজের হাতেই বাগানের সব কাজ করত কিংশুক। এখন বয়স হয়েছে। আর পেরে ওঠে না। পাশের গাছ থেকে একটা অচেনা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। ছোট কোনো পাখি হবে। গাছের পাতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তবু ডালপালার ফাঁকে তাকে খানিকক্ষণ খোঁজার চেষ্টা করল কিংশুক।

কিংশুকের ছোটবেলা কেটেছে কলকাতায়। সে বাড়ির কথা খেয়াল হল কিংশুকের। বহু পুরোনো বাড়ি। তার পাশেও—এত বড় না হলেও ছোট একটা বাগান ছিল। সেখানে কাঠঠোকরা আসত, ঘুঘু আসত, বউকথাকও আসত। দোতলায় তিনদিকে বারান্দা—একদিকে বড় ছাদ। মাঝে বড় দালান। সবসময় বাড়ি লোকজনে গমগম করত। নীচে কাজের লোকেদের ঘর। ওখানে থাকত বনোয়ারী, এতোয়ারী, গণেশ, আর—কি যেন ওই লোকটার নাম—যে ব্যবসার কাজে বাবার সঙ্গে সবসময় থাকত? মনে পড়ল না কিংশুকের। চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবার চেষ্টা করল। খেয়াল হল না। মনে না পড়াটা এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

বাবা ছিলেন রাশভারী মানুষ। শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও কড়া নজর ছিল কিংশুকের ওপর। পড়াশুনো করছে কিনা—পাড়ার খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশছে কি না—সবসময় খেয়াল রাখতেন। মা অবশ্য সারাক্ষণ ঘরের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তার মাঝেই কখনও কখনও 'খোকা' বলে নীচ থেকে ডাক দিতেন। কাজের জন্য না। হয়তো ভালো কিছু রান্না হয়েছে—কিংশুকের জন্য খানিকটা তুলে রেখেছেন, ও টেস্ট করে দেখবে বলে।

বাড়িটা ছিল পান্থশালার মতো। যে কেউ যখন—তখন এসে পড়ত। আগে থেকে বলার কোনো ব্যাপার ছিল না। আর, আসা মানে বেশ কিছুদিন থেকে যাওয়া। তবে তা নিয়ে কারুর মাথাব্যথাও ছিল না। হঠাৎ করে হয়তো পিসেমশাই এসে উঠলেন বহরমপুর থেকে। কলকাতায় কাজ পড়েছে। একসপ্তাহ থেকে যাবেন। পিসেমশাইকে প্রচণ্ড ভয় পেত কিংশুক। চওড়া গোঁফ, বেজায় চিল্লিয়ে কথা বলেন। কথায় কথায় পিঠের ওপর দারুণ জোরে চড় মেরে বলে উঠবেন—'পড়াশোনা ঠিকঠাক হচ্ছে তো!' অনেক সময় ওই হনুমানের মতো চড়ের পর কথা বলাও মুশকিল হত। কিন্তু তবু—পিসেমশাই আসা মানেই—পিসতুতো ভাই—তুহিন আর তুষার—তারাও সঙ্গে আসত। ওরা প্রায় কিংশুকের সমবয়সি ছিল। দিনরাত গল্প, আড্ডা আর খেলা। তুহিন একসঙ্গে শিবপুরেও পড়েছে। পরে কোথায় যেন গেছে। না না, বোধহয় দেশেই ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে ভাবার চেষ্টা করে কিংশুক। নাহ, কিছুই খেয়াল হচ্ছে না।

'মিঠু'—ডেকে ওঠে কিংশুক। সাড়া পায় না। ঝোড়ো হাওয়া আরেকবার ইউ—ম্যাপলের পাতায় ঠান্ডা শিহরন জাগিয়ে চলে যায়। 'মিঠু'—আবার ডেকে ওঠে কিংশুক। সাড়া না পেয়ে বাগান থেকে বাড়ির দিকে এগোয়। ড্রয়িংরুমের কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। পাশেই রান্নাঘর। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় কিংশুক। না, মিঠু তো নেই! কোথায় গেল? এই তো খানিক আগে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করল। এসময় তো ও কোথাও যায় না। কিংশুকের এখন ওষুধ খাওয়ার সময়। এত বেয়াক্কেল তো ও নয়! ফোনের দিকে এগোয় কিংশুক। কত যেন নাম্বারটা মিঠুর সেলের? 935... নাহ, পরের কোনো ডিজিট মনে আসছে না। ড্রয়ারের মধ্যে কোথাও আছে কি? ড্রয়ারটাই বা কোথায়? চেনা কিচেনটাও যেন হঠাৎ খুব অচেনা লাগে। চেয়ার—টেবিলটাও অজানা মনে হয়। মনে হয় অন্য কারুর বাড়িতে এসে পড়েছে।

ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে পড়ে কিংশুক। খুব অসহায় লাগে। মনে হয় ওকে একা রেখে পৃথিবীর সব লোক মঙ্গলে পাড়ি দিয়েছে। সামনে একটা পুরোনো অ্যালবাম। কাল মিঠু বার করে দেখাচ্ছিল। তখন কিংশুকের খুব ক্লান্ত লাগছিল। তাই দেখেনি। অ্যালজাইমার হবার পর থেকে এটা প্রায়শই হয়। হঠাৎ করে জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না কিংশুক। ইচ্ছে হয় কাটা ঘুড়ির মতো হাওয়ার স্রোতে গা এলিয়ে দিতে।

কালকে সেরকমই মনে হচ্ছিল। তখন তাই অ্যালবামের পাতাগুলো চোখেই পড়েনি। সকালের দিকে পুরোনো দিনের কলেজের বন্ধু শৈলদা এসেছিল। কিংশুকের দু'বছর আগে আমেরিকায় আসে শৈলদা। ষাটের দশকে তখন এখানে এত ভারতীয় ছিল না। আর বাঙালি তো হাতে গোনা। তাই শৈলদার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তারপর তিরিশ বছর ধরে এখানেই কাছাকাছি দুটো পরিবার থাকত। রেগুলার যাতায়াত—আড্ডা লেগেই থাকত। বছর দশেক আগে শৈলদা আমেরিকার অন্য একটা শহরে চলে যায়। তখন থেকে যোগাযোগ খানিকটা কমে আসে। তাছাড়া, দুজনেরই বয়স হয়েছে।

তা সেই শৈলদাই হঠাৎ করে এতটা পথ ড্রাইভ করে কাল এসে হাজির। কথায় কথায় হঠাৎ শৈলদা বলে উঠল যে ফোর্ড গাড়ির ফ্যাক্টরিতে অ্যাসেম্বলি লাইনে নাকি কিংশুকের থিয়োরি ব্যবহার করেছে।

কি একটা নামও বলল। শুনে হাসলেও, ওই থিয়োরিটা কি তা এখনও মনে পড়েনি কিংশুকের। অথচ ওর নিজেরই নাকি লেখা। ইউনিভার্সিটিতেও নাকি ওর ওই সাপ্লাই চেন থিয়োরি সর্বত্র পড়ানো হয়।

সারাটা দিন মনটা উসখুস করেছে। চায়ের কাপ নিয়ে ঘণ্টাখানেক বসে থেকেছে, কিন্তু থিয়োরিটা সেই অধরাই থেকে গেছে। দিনটাকে আরো উদাসীন করে তুলেছে। এ তো সন্তানকে হারিয়ে ফেলার মতো। সেই থেকেই মনটা খারাপ। সন্ধেবেলা মিঠু পুরোনো দিনের অ্যালবাম বার করে দেখাচ্ছিল। অনেক বছর আগের সেই অতীতের ছবিগুলো। কিন্তু তখন আর তাতে মন ছিল না কিংশুকের। আজ পাতা ওলটাল।

টাই—স্যুটে সুদর্শন কিংশুক। কখনো কনফারেন্সে তো কখনও ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। অনেকেরই নাম মনে পড়ছে না। আবার বহু বছর পুরোনো অ্যালবামের পাতা থেকে হঠাৎ করে কেউ কেউ যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিচ্ছে। যেমন, প্রফেসার ওসাকা। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এনার সঙ্গে একসঙ্গে রিসার্চ করেছে কিংশুক। তখন ওরা ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিল। প্রফেসার ওসাকা ছিলেন সত্যিই কাজ—পাগলা লোক। আর তেমনই অন্যমনস্ক। মাঝে—মধ্যেই ভুল করে অন্য বাড়িতে ঢুকে পড়তেন। লেডিস বাথরুমে ঢুকে যেতেন। ওসাকার কথা মনে পড়তে আপন মনেই একটু হেসে উঠল কিংশুক।

অনেকের ছবি খুব চেনা লাগছে। নাম মনে আসছে না। অনেকের নাম মনে আসছে, কিন্তু কিভাবে পরিচয় খেয়াল হচ্ছে না। সেরকমই একটা ছবি অনেকক্ষণ ধরে কিংশুক দেখতে থাকে। সাদা—কালো ছবি। কিংশুক যখন আমেরিকায় প্রথম পড়তে আসে, তখন দমদম এয়ারপোর্টে তোলা ছবিটা। তখন বিদেশে আসা — আমেরিকায় আসা এত ব্যতিক্রমী ছিল যে আত্মীয় স্বজন—পাড়া প্রতিবেশী—সবার মধ্যে হইচই পড়ে যেত। এয়ারপোর্টের ছবিতে তাই চেনা—অচেনার ভিড়। হবে নাই বা কেন? তখন চলে আসা মানে, সত্যিই চার—পাঁচ বছরের মধ্যে আর দেখা না হওয়া। তারমধ্যেই কতজন চেনা—পরিচিত হারিয়ে যেত। আয়নায় কত মুখ পালটে যেত।

মার মৃত্যুতেই কিংশুক ফিরতে পারেনি! খবর পাওয়ার পরে চারদিন লেগে যাচ্ছিল দেশে ফিরতে। তখন এত রেগুলার ফ্লাইটও ছিল না। ততক্ষণ মৃতদেহ রাখাও সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাই যায়ওনি কিংশুক। এমনিতেও এত দূরে থাকতে থাকতে অজানা এক দূরত্বও তৈরি হয়ে যায়। টানও কমে আসে।

এয়ারপোর্টের ছবিটাতে প্রায় কুড়িজন আছে। প্রত্যেকের মুখ স্পষ্ট বোঝাও যাচ্ছে না। কিংশুকের পাশে মা, তার পাশে পিসি— আর তার পাশের মেয়েটা কে যেন? খুব চেনা লাগছে অথচ কে ছিল ঠিক মনে পড়ছে না। হাল ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল কিংশুক, হঠাৎ খেয়াল হল। আরে, এ তো চন্দনা। একই পাড়ায় থাকত। ওর থেকে বছর চারেকের ছোট। এর সঙ্গেই প্রথম প্রেম কিংশুকের। হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার সময় এক বিয়েবাড়িতে আলাপ হয়। তারপর আলাপ এগোয় আত্মীয়—পরিজনদের চোখ এড়িয়ে। বাড়ির শাসন এড়িয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম দেখতে তখনও কলকাতা অভ্যস্ত হয়নি। তাই, কখনও চন্দনার স্কুলের বাইরে পাঁচমিনিট কথা, কখনও বা ফুচকা খেতে খেতে চোখে চোখে কথা—এর বেশি প্রেম এগোয়নি। ওদের মধ্যে ছিল কিছু না—বলা কথা—কিছু কবিতা—যার অর্থ শুধু দু'জনের চোখেই ধরা পড়ত। আর ছিল অহেতুক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা। কিছু বিহ্বল মুহূর্ত।

যখন কিংশুক শিবপুরে পড়তে গেল, তখন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। চন্দনার এক বন্ধুর বাবা শিবপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতেন। ওদের বাড়ি ছিল ক্যাম্পাসের মধ্যেই। তখন চন্দনাও মাঝে—মধ্যে ওর বান্ধবীর বাড়িতে যেত। সেই সূত্রেই শিবপুরে নিয়মিত দেখা হতে শুরু হল। দু'দিকের বাড়ির লোকেরাই এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল না। খেয়াল করারও কেউ ছিল না।

প্রেম যখন চোরাগলি দিয়ে এগোয়, তখন আরো গভীর হয়। এক্ষেত্রেও তাই হল। চন্দনা বান্ধবীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় হঠাৎ করে উধাও হয়ে যেত। কিংশুকও ক্লাস শেষের খানিক আগেই নিখোঁজ হত। এভাবে তিন—চার বছরে ওদের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

কিছুদিন দেখা না হলেই কিংশুকের মন চঞ্চল হয়ে উঠত। প্রেম মন থেকে ছড়িয়ে পড়ল ঠোঁটে—ঠোঁট থেকে শরীরে। নদী যখন উত্তাল হয়—ঝড় যখন সত্যিই ওঠে—তখন তা সবার চোখে পড়ে। ওদের প্রেমের কথাটাও বাড়ির লোকের জানতে বাকি রইল না।

তখন অবশ্য এসব নিয়ে কোনো আলোচনা হত না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। পক্ষে বা বিপক্ষে। একদিন কিংশুক হঠাৎ জানতে পারল যে চন্দনারা অন্য শহরে চলে যাচ্ছে। ওর বাবা ট্রান্সফার হয়ে দিল্লি চলে যাচ্ছেন। কিংশুক তখন ইঞ্জিনিয়ারিং—এর থার্ড ইয়ারে। তবে কলকাতায় চন্দনার দাদু—দিদা ছিল বলে বছরে অন্তত বার দুয়েক যাতায়াত ছিল। আর সে ক'দিন সময়ও যেন ওদের কাছে লজ্জা পেত—তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত বলে।

কিংশুক যখন কলকাতা ছেড়ে আমেরিকায় আসে, তখন চন্দনা কিভাবে যেন কলকাতায় আসার উপায় বার করেছিল। এয়ারপোর্টেও এসেছিল সেদিন। আসার আগের দিন ওরা রাত এগারোটার সময় একটা অচেনা রাস্তার অজানা মোড়ে দেখা করেছিল। সেদিন ভয় ছিল না—লজ্জা ছিল না—সমাজও ছিল না ওদের মধ্যে। কিংশুক ওকে জড়িয়ে ধরে জানিয়েছিল—এ তো শুধু কয়েকদিনের ব্যাপার। তারপরে ও ফিরে আসবে। দু'বাড়ির আপত্তিও সময়ের দাগে ফিকে হয়ে যাবে।

আজ এতো বছর বাদেও কিংশুকের কাছে ওই রাতের ওই কয়েকটা ঘণ্টা স্পষ্ট। সেদিন সাক্ষী ছিল রাস্তার দু—একটা কুকুর— শরতের মেঘে ভাসা আধফালি চাঁদ—রাতের ঝিমোতে থাকা হলুদ আলোয় কয়েকজন পথচারী।

কাঁদতে কাঁদতে চন্দনা বারবার বলেছিল—'কথা রাখবে তো? আমি অপেক্ষা করব।' আর কিংশুক ওকে শুনিয়েছিল সে ভালোবাসার কথা—যা সাগরের দূরত্ব মানে না, যাতে সময়ের দাগ পড়ে না। মাথার উপরের আকাশের মতো যা কখনও হারিয়ে যায় না।

কিংশুক কথা রাখেনি। কয়েকযুগ এগিয়ে থাকা অচেনা এক দেশ ওকে এমন এক মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিল যে সেই আনন্দে, সে যৌবনের উন্মত্ততায় চন্দনা হারিয়ে গেল। ওদিক থেকে চিঠি আসত—প্রথম দিকে প্রতি সপ্তাহে, তারপর উত্তর না পাওয়া চিঠিগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গতি কমল। সপ্তাহ থেকে মাস। পড়েও দেখত না কিংশুক। একসময় চিঠি আসা থেমে গেল।

আসার সাত বছর বাদে যখন পি এইচ ডি শেষ করে কিংশুক দেশে ফিরল, তখন চন্দনাকে অনেকের ভিড়ে ও ভুলে গেছে। ভুলে গেছে বাড়ির লোকেরাও। দিন কুড়ির ছুটিতে গিয়েছিল। তখনই মিঠুকে বিয়ে করে আবার আমেরিকায় ফিরে এল কিংশুক। তারপর চল্লিশ বছর কেটে গেছে। চন্দনাও হারিয়ে গেছে পুরোনো অ্যালবামের পুরোনো ছবির ভিড়ে।

আজ হঠাৎ অ্যালবামে ছবি দেখে ওর মনে পড়ল জীবনের সেই প্রথম হারিয়ে যাওয়া—জীবনে সেই প্রথম নারীশরীরের স্বাদ, আর মনে পড়ল না—রাখা সেই কথা। চন্দনা এখন কোথায়? মনের সব ব্যাকরণ হঠাৎ হারিয়ে গেল চন্দনায়।

নাহ, এই মুহূর্তেই ভারতে ফিরবে কিংশুক। মিঠুর কোনো বারণ শুনবে না। মিঠুর নাম্বারটা আর একবার খোঁজার চেষ্টা করল। না পেয়ে গাড়ির চাবির খোঁজ করল কিংশুক। এটা জায়গায় আছে। শোবার ঘরের ড্রয়ারে, মানিব্যাগের পাশে। চাবিটা নিয়ে ওই পোশাকেই গ্যারেজে চলে এল কিংশুক। মিঠুর গাড়িটা নেই। পাশে ফোর্ডের লাল এস ইউ ভি। এটাই কিংশুক চালাত। অসুস্থতার পরে অনেকদিন চালায়নি যদিও। কিন্তু আজ ওর ভয় লাগল না। কাঁপা হাতে রিমোট দিয়ে গ্যারাজের দরজা খুলে ব্যাক গিয়ারে গাড়িটা বাইরে নিয়ে এল।

কিংশুক বরাবরই জেদি। মনে যখন পড়েছে, তখন আজই ফিরবে ভারতে। হয়তো চন্দনা আজও ওর অপেক্ষায় আছে। হয়তো এখনও কথামতো শিবপুরের সেই ক্লকটাওয়ারেই ওয়েট করছে।

বাড়ির লাগোয়া প্রাইভেটলি মেনটেনড রোড। মাটির রাস্তা। তারপর ভালো রাস্তা। এয়ারপোর্টটা নর্থের দিকে। 12 নর্থ দিয়ে যেতে হয়। গাড়ি চালাতে থাকে কিংশুক। কিন্তু চালাতে গিয়ে বুঝতে পারে হাত কাঁপছে। সামনের রাস্তা হঠাৎ অচেনা লাগে। এয়ারপোর্ট? কোন এয়ারপোর্ট? রাস্তার ডিরেকশানগুলোও দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। কিংশুকের গাড়ির স্পিড কমে এসেছে। পেছন থেকে অন্য গাড়িগুলো ক্রমাগত হর্ন দিয়ে চলেছে। স্টেট হাইওয়ের উলটোদিকের গাড়িগুলোর গতি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে কিংশুককে। বাধ্য হয়ে একটা পেট্রোল পাম্পে গিয়ে ঢোকে কিংশুক। ঢুকেই মনে হয় খুব খিদে পেয়েছে। পেট্রোল পাম্পের মধ্যে একটা সাবওয়ের দোকান। সেখানে গিয়ে ঢোকে কিংশুক। স্যান্ডুইচ আর ব্ল্যাক কফি অর্ডার করে—করেই খেয়াল হয়—পকেটে ম্যানিব্যাগ নেই। টাকা নেই—ক্রেডিট কার্ড নেই—ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও নেই।

দোকানের লোকগুলো ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। যেন ওদের চোখ এড়ানোর জন্যই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসে কিংশুক। কিছু দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ও গাড়ির কাছে এগিয়ে আসে। হঠাৎ করে সব যেন গুলিয়ে যায়—কোথায় যাচ্ছিল—কেনই বা যাচ্ছিল—ওর বাড়ির ঠিকানাই বা কি!—এসব জটিল ধাঁধার সমাধান যখন ও গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, একজন লোক ওর দিকে এগিয়ে এল—'ডু ইউ নিড এনি হেল্প স্যার?'

'আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক—গো ব্যাক টু মাই হোম।'

'হোয়্যার ডু ইউ স্টে?'—লোকটা জিগ্যেস করে।

'ইন্ডিয়া—ওখানেই যেতে চাই। ওখানে শিবপুরে—শিবপুর কলেজে। ওখানে একটা বড় ক্লকটাওয়ার আছে—ওখানেই যেতে চাই। ওখানে একজন ওয়েট করছে।'

লোকটা কিছুই বুঝে ওঠে না। শুধু ওর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে গাড়িতে গিয়ে ওঠে। কিংশুকের গাড়িটা চালিয়ে চলে যায়।

কিংশুক নিশ্চিন্ত হয়। তাহলে চন্দনাকে আনতেই গেছে লোকটা। অনেক অনেক কথা বলার আছে চন্দনাকে। অনেক ক্ষমা চাওয়ার আছে। ততক্ষণ বসা যাক। কিংশুক বসার জায়গা খোঁজে। মাথার ওপরে মেঘহীন শূন্য আকাশ। সকালের আদুরে রোদে এখন উত্তাপ এসেছে। জলতেষ্টা পাচ্ছে। কি করা উচিত কিছুই মাথায় আসে না। পেট্রোল পাম্পের পার্কিং লটে একটা গাছের ছায়ায় বসে ঝিমোতে থাকে কিংশুক। অপেক্ষা করে চন্দনার। কত বছর কেটে গেছে, চিনতে পারবে তো? হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নিচু করে ভাবে কিংশুক।

মেঘের সঙ্গে খেলা করতে করতে সূর্যটা যে কখন পেট্রোল পাম্পের পেছনে উধাও হয়েছে তা খেয়াল করেনি কিংশুক। হঠাৎ ওর মনে হয় যে একজন দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। সময়ের ওপার থেকে।

'চন্দনা!'—চেঁচিয়ে ওঠে কিংশুক। চন্দনা আরো এগিয়ে আসে। কিংশুক বলতে থাকে—'চন্দনা, এসেছ তাহলে? রাগ করোনি তো? ভুলে গিয়েছিলাম। তা দেরি হলেও দেখো ঠিক এসেছি, যেরকম কথা ছিল। দেখো ক্লকটাওয়ারের নীচে সেই কখন থেকে বসে আছি।'

'কি আবোল—তাবোল বলছ? আমি মিঠু!'

কিংশুক মিঠুর হাত দুটো ধরে বলতে থাকে—'বিশ্বাস করো চন্দনা, আমি তোমাকে ভুলে যাইনি। তাই ছুটি পেতেই ইন্ডিয়া চলে এসেছি। দেখো ঠিক সেই ক্লকটাওয়ারের নীচে। যেমনটি কথা ছিল।'

'চন্দনা কে? আমি মিঠু। সেই সকাল থেকে তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান। একটু বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি তুমি নেই। গাড়িও নেই। পুলিশেও জানিয়েছি। তোমার গাড়িও তো চুরি হয়ে গেছে। গাড়িতে সেলফোন ছিল। তাতেও ফোন করে পাচ্ছি না। শেষে এই পেট্রোল পাম্পের থেকে খবর যায় যে একজন নাকি সকাল থেকে এখানে বসে আছে। তা শুনেই সন্দেহ হয়।'

কিংশুকের হুঁশ ফেরে—আস্তে আস্তে বলে ওঠে—'কিন্তু চন্দনাকে যে আমি বলেছিলাম—আমি ফিরে আসব, তার কি হবে?'

'কে চন্দনা? তোমার পাড়ার সে মেয়েটা? সে তো কবে মারা গেছে! শুনেছিলাম আমাদের বিয়ের দু'দিন পরে মেয়েটা ভিড় ট্রেনে উঠতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ে।'

কিংশুক হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মিঠুর হাতটা জড়িয়ে ধরে। আকাশের দিকে তাকায়। বিদায়ী সূর্যের আবির খেলায় শুধু একটা কথাই আজ ওর মনে পড়ে—তুমি ফিরে আসবে তো?

সমাপ্ত